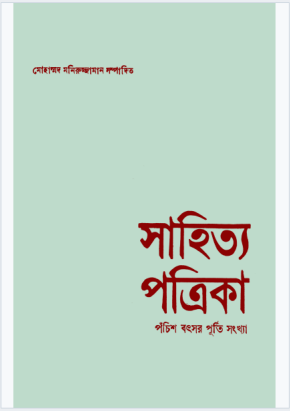

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ধ্বনিবিজ্ঞান

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী দীন মুহম্মদ
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.1
Pages	1-37
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

ধ্বনিবিজ্ঞান

কাজী দীন মুহম্মদ

১. ধ্বনিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মোটামুটি ধ্বনিবিজ্ঞানে (phonetics) বাক্-ধ্বনিই আলোচিত হয়ে থাকে। এ ধরনের আলোচনায় বাক্-ধ্বনির প্রতীকীরূপ, বাক্-যন্ত্রের সাহায্যে যে ভাবে বাক্ধ্বনি উচ্চারিত হয়, শ্রবণ-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভূত ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা, এবং সবশেষে একই দেশের বিভিন্নাংশে অথবা পৃথিবীর বিভিন্নাংশে এ ধ্বনিগুচ্ছের বিভিন্ন ব্যবহার ও বিভিন্ন উচ্চারণ পদ্ধতি সবকিছুই বিবেচনা করা হয়। সাধারণতঃ এই ধরনের আলোচনায় ধ্বনিগুলোকে চিত্রিত করার জন্য কতকগুলো উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত প্রতীক অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

মূল ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics proper) এবং ফলিত ধ্বনিবিজ্ঞান (applied phonetics) এ দুয়ের পৃথকীকরণের জন্য সাবধানতা অবশ্যই আবশ্যকীয়। উপরে বর্ণিত মতানুসারে বাক্-ধ্বনির উৎপত্তি (production), গ্রহণ (reception) এবং প্রতীক ব্যবহারের দিক থেকে মূল ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics proper) হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। এ ধরনের আলোচনায় ধ্বনিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রও প্রয়োগ ব্যাপক। কিন্তু এগুলোকে সবসময় ফলিত ধ্বনিবিজ্ঞান বা applied phonetics বলা সঠিক হবে না। অনুরূপভাবে অশুদ্ধ বাক্-প্রবাহ শুদ্ধ করার জন্য বা আদর্শ বাক্প্রবাহের জন্য ধ্বনিবিজ্ঞানের ব্যবহারকে proper ধ্বনিবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না বরং এটি applied ধ্বনিবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত।

উপরে বর্ণিত মতানুসারে ধ্বনিবিজ্ঞানের উপাদান-সমূহের বহুবিধ ব্যবহার হতে পারে। (১) ভাষাতত্ত্বের অন্য শাখার আলোচনার জন্য, যেমন, রূপতত্ত্ব বা morphology, শব্দবিজ্ঞান বা etymology, উপভাষা আলোচনা বা dialectology ইত্যাদি; (২) বাক্ শুদ্ধিকরণের ক্ষেত্র; (৩) উচ্চারণ বিজ্ঞান, বাক্-মনস্তত্ত্ব ও অন্যবিধ আলোচনা; (৪) এই জাতীয় ব্যবহারিক ধ্বনিবিজ্ঞান, যেমন মধ্যস্থতা interfere, স্বর-শিক্ষা এবং সাধারণ বাক্-পদ্ধতি ইত্যাদি; (৫) অভিনয় বিদ্যায় বা নাটকের জন্য ব্যবহৃত কোন পূর্বনির্ধারিত সংলাপে এবং তার জন্য মঞ্চ-উপযোগী শিক্ষা; (৬) অভিধান, অনুশীলনী বা workbooks ইত্যাদির সাহায্যে সাধারণ উচ্চারণ শিক্ষা।

আনুষঙ্গিক ক্ষেত্র (Allied field)

একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, ধ্বনিতাত্ত্বিক জ্ঞান এ সম্পর্কিত অন্যান্য জ্ঞান-শাখার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। দৈহিক গঠন (anatomy), স্নায়ুবিদ্যা (neorology), প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া (physiology) ইত্যাদি বাক্ প্রত্যঙ্গের গঠন এবং ক্রিয়াশীলতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। ধ্বনির প্রকৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান এবং বাক্-প্রত্যঙ্গের প্রকৃতি

সম্পর্কে বিশেষজ্ঞান পদার্থবিদ্যা থেকে নেওয়া হয়েছে। বাক্-ধ্বনির প্রতীকী-প্রকৃতি বোঝার জন্য মনস্তত্ত্ব সাহায্য করে। বলা বাহুল্য, বাক্ সম্বন্ধীয় অন্যান্য আলোচনা বিশেষ করে বাক্-বিজ্ঞান বা speech science-এর সঙ্গে ধ্বনিবিজ্ঞান নিবিড় ভাবে সম্পর্কিত।

ধ্বনি-পরিবর্তন, উপভাষা ও বিদেশী ভাষা আলোচনা প্রসঙ্গে ভূগোল, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বও আলোচনা করা হয়। ধ্বনিবিজ্ঞান ভাষাতত্ত্বের একটি শাখা এবং এটা এই-ভাবে শব্দতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণের বা ধ্বনি বিন্যাসের (orthography) সঙ্গে সম্পর্কিত।

গবেষণাগারে ধ্বনিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও আলোচনার জন্য ব্যাপক বৈজ্ঞা-নিক দক্ষতা (technical skill) এবং এর বিভিন্ন শাখায় জ্ঞান দরকার। এই ধরনের পরিকল্পনায় বাক্‌ধ্বনির ধ্বনি বৈপরীত্যের রেকর্ডিং বা phonographical recording কার্যকালে বাক্ যন্ত্রের এক্স-রে দ্বারা ছবি তৈরী, palatograms তৈরী, বাক্‌ধ্বনি উৎপাদনের সময় স্বরসম্বন্ধীয় ও উচ্চার্য বা articulatory যন্ত্রাদি, বাক্ প্রবাহে উপস্থিত ধ্বনিতরঙ্গের বিশ্লেষণ এবং ধ্বনি পরিমাপক যন্ত্রলিপি বা kymographic tracing প্রভৃতি কাজ ধ্বনিবিজ্ঞানের গবেষণাগারে হয়ে থাকে।

ধ্বনিবিজ্ঞানের আলোচনায় কতগুলো মৌলিক সূত্র

১. বাক্ প্রত্যঙ্গের অংশ বিশেষ দ্বারা বাক্‌ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই বর্ণনার দ্বারা নির্দেশিত হয় যে, ধ্বনিতত্ত্বের পঠন-পাঠনে এর একটি বিশেষ উপাদান যা সংযোগ এবং পরিচালনা করে পেশী, স্নায়ু এবং তন্তু বা tissues। বাগযন্ত্র বা speech organs-এর বিভিন্ন গঠন ও তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্নায়বিক এবং শারীরস্থানসমূহের বিদ্যা বিশেষ ভাবে কার্যকরী হবে। এর অর্থ হলো, উৎসারিত ধ্বনির প্রকৃতি সব সময়েই নিয়ন্ত্রণকারী পেশীর ওঠানামা এবং স্নায়বিক ক্রিয়ার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত এবং বিধিনিষেধের প্রেক্ষিতে পরিচালিত হয়। অবশ্য এই সব নিয়ন্ত্রিত ক্রিয়া ছাড়াও ধ্বনির আরও কতক-গুলো জরুরী ক্রিয়া আছে যা বাক্ প্রবাহের উপরে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

২. বাক্ প্রবাহের ধ্বনিগুচ্ছ সব সময় শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। এই বাক্ প্রবাহের উৎসারিত ধ্বনিগুচ্ছসমূহ সব সময় গৃহীত এবং সম্মিলিত হয় শ্রবণেন্দ্রিয়ের অবয়বিক গঠন প্রণালী এবং সংশ্লিষ্ট বিষয় ও মস্তিষ্ক দ্বারা। এই বিষয়ে শ্রুতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বাক প্রবাহের ধ্বনিগুচ্ছ সমূহ সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। যেমন, সাধারণ ভাবে ধ্বনির পদার্থবিদ্যা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের গঠন-কার্যাবলী এবং তার ব্যবচ্ছেদবিদ্যা, সম্ভাব্যতা ও সীমাবদ্ধতা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরিসীমা, বহন করবার ক্ষমতা, ধ্বনি, মীড় (pitch), কণ্ঠস্বরের উচ্চগ্রাম নিম্নগ্রাম (volume), শব্দের অনুরণন (resonance), প্রচাপন বৈশিষ্ট্য (pressure patterns) ইত্যাদিকে পৃথকীকরণের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধ্বনির শ্রুতিগত পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া, বাক্ প্রবাহের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য শিক্ষা এবং ধ্বনির সংগঠনিক প্রবাহগত ভুলভ্রান্তি, পারম্পর্য, প্রাঞ্জলতা ও আড়ষ্টতার বৈশিষ্ট্য—এসবও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য।

৩. বাগধ্বনি প্রতীক একক : বাগধ্বনি বা speech sounds গুলো বস্তুতঃ প্রতীক-একক বা symbol units। সমস্ত বাক প্রবাহের ধ্বনিগুচ্ছ সমূহ অপরিবর্তনীয় একক হিসেবে পরিবেশিত হয়। সর্বসম্মতিক্রমে প্রতীক বা symbol হিসেবে এই সবের ব্যবহার ও প্রয়োগ লক্ষণীয়। এ সবের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক বিষয়বস্তু, গুণ ও ক্রিয়ার সঙ্গে ভাবের সংযোগ সাধন করা হয়।

৪. বাক্ প্রবাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না ; অনুশীলনীর মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। প্রতিটি শিশুই নতুন করে শ্রুতিগত প্রতীক (symbol) শিক্ষা করে এবং সে তা নিরন্তর নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহার করে। তাছাড়া মানব সমাজের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। জটিল symbol সমূহের সৃষ্টি ও প্রয়োগ বিধান করা সভ্যতার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই ব্যাখ্যা এক সময় বিতর্কের বিষয় ছিল, কিন্তু এখন এটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যে পরিণত হয়েছে। এবং এর কার্যকারিতা বাক্ প্রবাহের যে কোন স্তরের বেলায় প্রযোজ্য। বারবার অনুশীলনীর মাধ্যমে বাক্ প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সাধনার মাধ্যমে একে অর্জন করতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ, শিশুদের বাক্ প্রবাহের শিক্ষা, বিদেশী ভাষা শিক্ষা ও উপভাষার সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে।

৫. বিভিন্নতা দ্যোতনার জন্য যে শক্তি প্রযুক্ত হয় বাগ্ধ্বনি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। পূর্বে উৎসারিত কোন উপস্থাপিত বাক্ প্রবাহে কার্যকারিতার বিধান সম্পর্কে অনেক বিকল্প দেখা যায়। আর তা খুব কমই শ্রুতিগত দিকের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই ব্যাতিক্রম কোন ব্যক্তির বাক্ প্রবাহের কিছু সংখ্যক বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে ধরা পড়ে। অবশ্য এটি একই পরিবেশগত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একই বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়। এ বিশেষত্ব একই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে কিংবা বিভিন্ন দেশে, যেখানে একই ভাষার ব্যবহার রয়েছে, সেখানে ব্যতিক্রমধর্মী উপভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এই বিধি বা নিয়মে যে ধ্বনিগুচ্ছের উৎপত্তি হয়, সে সমস্ত ব্যতিক্রম নিম্নরূপে বিশ্লেষিত হতে পারে।

১. স্নায়ু পেশীগত ওঠানামার পুনরাবৃত্তির পরিপূর্ণ সার্বিক বৈশিষ্ট্যের অসামর্থ্য ; এবং ২. সার্বিক অবয়বের অবস্থানগত এবং বাক্ প্রবাহের কার্যকারিতা যা ধ্বনির উৎপাদন বিষয়ে বিশেষভাবে প্রভাবিত। এই গঠনগত ব্যতিক্রম এক ব্যক্তি থেকে আর এক ব্যক্তিতে লক্ষণীয় পার্থক্যে বিধৃত।

প্রতিবেশী ধ্বনিসমূহ

মানুষ তার পরিবেশ থেকে যা শোনে তা থেকে তার নতুন ধ্বনি তৈরী করার একটি বিশেষ প্রবণতা থাকে। এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় এ জন্য যে, শোনার ব্যাপারে শিক্ষার অভাবে বাক্ প্রবাহে ধ্বনিগুচ্ছের সব সময় ব্যতিক্রম দেখা যেতে পারে। আর যোগাযোগের অব্যবস্থা থাকলে এই ব্যতিক্রম বিভিন্ন জেলাতে বেশী প্রসারিত হতে পারে। অবশ্য এ ধরনের বাক্ প্রবাহের ধ্বনিগুচ্ছ সৃষ্টির ব্যাপারে একটি বিশেষ কার্যক্রম ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে উপভাষা সৃষ্টির কার্যে এবং উপভাষার পঠন-পাঠনে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৬. বিভিন্নতা প্রকাশের বাধা সৃষ্টির জন্য যে শক্তি প্রযুক্ত হয়, বাক্ধ্বনি তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কার্যকরী বৈধতায়ও পরিবর্তন বাধা প্রাপ্ত হয় এবং বাক্ প্রবাহকে স্বাধীন রাখে। বিশেষ ক্ষেত্রে বাক্ প্রবাহের ধ্বনিগুচ্ছসমূহ স্থির থাকে। যদি এই জাতীয় নিয়ম না থাকতো তা হলে হয়ত পরস্পর সন্নিকটবর্তী বসবাসকারীদের পক্ষে একে অপরের সংঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব হতো না। এরূপ ক্ষেত্রে বর্তমানে যেমন বিচ্ছিন্ন এলাকাকে মোটামুটি দ্রুততার সংগে চিহ্নিত করা যাচ্ছে, তেমন করা সম্ভবপর হতো না। কোন প্রাণীর অপরিবর্তনীয় শক্তি অবয়বগত প্রবণতার দ্বারা কমই

বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যকথায়, একই ধর্মী প্রতিক্রিয়া এবং কার্যাবলী প্রতিটি ক্ষেত্রে পর্যায়-ক্রমে সংঘটিত হয়, যদিও সেগুলো পুরাপুরি সমধর্মী নয়। এটি পুরাপুরি স্নায়ুতন্ত্রের, স্নায়বিক কার্যাবলীর ব্যাপার যা ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ উৎপাদনে বিশেষভাবে আবশ্যক। এই সার্বিক প্রক্রিয়ার প্রতিটি প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তির সংগে সংগে অপরিবর্তনীয় থাকে, এবং ক্রমে এগুলো যতই অপরিবর্তনীয় হয়, ধ্বনিগুচ্ছের পরিবর্তন ততই আয়াসসাধ্য হয়ে পড়ে। প্রতিক্রিয়াটির সাদৃশ্য পুরোপুরি স্থির নয়, এর একটি সম্ভাব্য ব্যতিক্রমের নির্দিষ্ট সীমা আছে।

তা ছাড়া, যখন বাক্-প্রবাহগত প্রক্রিয়া এবং শ্রুতিগত প্রক্রিয়া ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে বিভিন্নতা প্রাপ্ত হয় তখন সেগুলো আরও ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রায় সমধর্মী হতে দেখা যায়। পূর্বোল্লিখিত প্রক্রিয়ায় কোন নির্দিষ্ট নিরূপক নেই। গঠনগত দিক দিয়ে যে পার্থক্যের জন্য এরূপ ধ্বনির পরিবর্তন হয় তা সাধারণতঃ সামান্য, এবং সেগুলো ধ্বনির মৌলিক প্রকৃতিকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবিত করে না। এ একটি তৃতীয় শক্তি যা এরূপ ধ্বনি পরিবর্তনে বাধা দেয়। এর একটি ইন্দ্রিয়গত সমস্যার ভিত্তি আছে। যেহেতু এই একক ধ্বনিগুলো একত্রিত হয়ে একটি প্রতীক বা symbol গঠন করে এবং অর্থের ব্যঞ্জনায় পরিবেশিত হয়, তাই বক্তার উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যবহারের প্রেক্ষিতে যদি শ্রোতা অর্থব্যঞ্জনা গ্রহণে অসমর্থ হয় তবে এ ধ্বনির কোন সার্থকতা থাকেনা। অন্য কথায়, যে কোন নির্দিষ্ট বাক্-প্রবাহে যে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, তার যদি কার্যোপযোগিতা থাকে, এবং যদি শ্রোতা তার অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হয়, তবে তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার পৌণপুণিক অনুশীলনীর পর্যায়ে বিবেচ্য। এ ভাবে যদি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকে, তবে কোন নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে যতই আন্তঃসংযোগ সংস্থাপিত হয় ততই ভাষার ভিত্তি দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে ওঠে।

মোদ্দা কথা ধ্বনিতত্ত্ব বা phonology দু'পর্যায়ে ভাগ করে আলোচিত হয়।

১. ধ্বনিবিজ্ঞান বা phonetics এবং
২. ধ্বনি ব্যবহার পদ্ধতি বা phonemics।

১. ধ্বনিবিজ্ঞান বা phonetics সাধারণ ভাবে দু'টি বিধায় (aspect) বিভক্ত।

ক. উচ্চার্য ধ্বনিবিজ্ঞান বা articulatory phonetics এবং
খ. শ্রব্য বা শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনিবিজ্ঞান বা acoustic phonetics।

১. ক. বক্তা তার নিজের বাক্ যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উৎপাদন করে। এ শাখায় বক্তার উচ্চারণগত দিক বিশদভাবে আলোচিত হয়। একে বলা হয় উচ্চার্য-ধ্বনি-বিজ্ঞান বা articulatory phonetics। কোন কোন ধ্বনিবিজ্ঞানী একে motor phoneticsও বলে থাকেন।

১. খ. বক্তা যখন ধ্বনিগুলো উচ্চারণ করে তখন তার উচ্চার্য-ধ্বনি ইথারে ধ্বনি তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং তার নিজের ও শ্রোতার কানে তা অনুরণিত বা ধ্বনিত হয়। ধ্বনিবিজ্ঞানের এ বিধা বা aspectকে শ্রব্য বা শ্রুতিগ্রাহ্য বা acoustic ধ্বনিবিজ্ঞান বলে। এতে ধ্বনির শ্রুতরূপ বিশ্লেষণ করা হয়।

১. গ. এ ছাড়াও ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি তৃতীয় বিধা রয়েছে। লেবরেটরীতে যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চার্য-ধ্বনিগুলোকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এতে কাইমোগ্রামে (kymogram) স্বর কম্পনের রেখায়, উচ্চতা নীচতা, ঘোষতা অ-ঘোষতা, অল্পপ্রাণতা মহাপ্রাণতা ইত্যাদি বিচার করা যায়। আবার প্যালেটোগ্রাম (palatogram) বা নকল

তালুর ছাপ পর্যবেক্ষণ করে জিহ্বার অবস্থান ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা যায়। ধ্বনিবিজ্ঞানের বিশ্লেষণের এ বিধা (aspect)-কে বলা যায় ল্যাবরেটরীতে যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি বিশ্লেষণ মূলক ধ্বনিবিজ্ঞান, Instrumental বা Experimental phonetics।

মোটের উপর ধ্বনিবিজ্ঞান শাখায় (phonetics) বিভিন্ন বিধায় (aspect) উচ্চার্য (articulatory), শ্রব্য (acoustic) এবং যন্ত্র-সহায়তা (instrumental or experimental) বাক্ প্রত্যঙ্গ, ভাষায় ব্যবহৃত উচ্চারণ স্থান (point of articulation) এবং উচ্চারণ রীতি (manner of articulation) বিশ্লেষণ করা হয়। ধ্বনিসমূহ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্বরধ্বনি (vowel), অর্ধস্বরধ্বনি (semi-vowel), দ্বিস্বরধ্বনি (diphthong), ত্রিস্বরধ্বনি (triphthong), ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant), নাসিক্যধ্বনি (nasal), ঘোষধ্বনি (voiced), মহাপ্রাণধ্বনি (aspirated), যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি (cluster or conjugated), ইত্যাদি নানাভাগে বিশ্লেষণ করা হয়। অধিকন্তু এ শাখায় ধ্বনির স্বরগ্রাম (pitch or tone), প্রস্বর (stress) ইত্যাদিও শ্রেণীমত বিন্যাস করে ধ্বনি বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়।[১]

২. ধ্বনি ব্যবহার পদ্ধতি বা phonemics শাখায় ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রাপ্ত উপাত্ত সমূহেরই বৈজ্ঞানিক প্রতীকীকরণের পদ্ধতিসমূহ আলোচিত হয়। phonology বা ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে।[২]

২. বাক্ প্রত্যঙ্গ (Organs of Speech)

একদিকে যেমন প্রাণ ধারণের জন্যে মানুষ ফুস্‌ফুসের সাহায্যে শ্বাস গ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ করে, অন্যদিকে তেমনি ধ্বনিকে স্বকীয় স্বীকৃতিতে পরিচিত করে তুলতে ফুসফুসের উপর নির্ভর করতে হয়। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ ফুস্‌ফুস অবিরত পাম্পের কাজ করে যাচ্ছে। শ্বাসবায়ু বেরুবার কালে গলনালী ও মুখবিবরের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষের ফলে বিভিন্ন ধ্বনির উৎপত্তি হয়। সংঘর্ষের স্থান, রূপ ও পরিমাণের মাপকাঠিতে এই সমস্ত ধ্বনির বিচার করা হয়। কিন্তু এর ব্যতিক্রমও আছে। অর্থাৎ আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি তখন ঠোঁট কিংবা মুখ-গহ্বরের স্থান বিশেষে বাতাস বাধা পেয়ে 'বিপরীত স্পর্শ' (implosive), 'শীৎকার' বা 'কাকুধ্বনি' (clicks) প্রভৃতি ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এ দিক থেকে ফুস্‌ফুসকেই ধ্বনির উৎপাদক যন্ত্র বা generator বলে ধরে নিলে কিছুমাত্র ভুল হয়না। ফুস্‌ফুস থেকে আরম্ভ করে মুখবিবর অথবা নাসাপথ পর্যন্ত এ নিঃশ্বাস-বায়ু বের হবার পথে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধ্বনি সৃষ্টিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করে তাদের বাক্‌প্রত্যঙ্গ বা organs of speech বলে।

শ্বাস বায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় নিম্নলিখিত প্রত্যঙ্গ সমূহ ক্রিয়াশীল থাকে

১। অধিজিহ্বা (epiglottis)
২। স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তীপথ (glottis)
৩। বায়ুনালী (windpipe)
৪। শ্বাসনালী (bronchial tubes)
৫। ডান ফুস্‌ফুস (right lung)
৬। বাম ফুস্‌ফুস (left lung)
৭। মধ্যচ্ছদা (diaphragm)

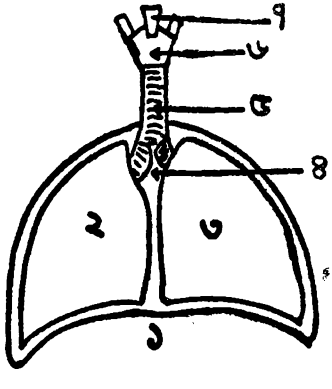

বিভিন্ন প্রকার বাগ্‌ধ্বনি ((speech sounds)) উচ্চারণ করবার জন্যে যে সমস্ত বাগযন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাদের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হলো।

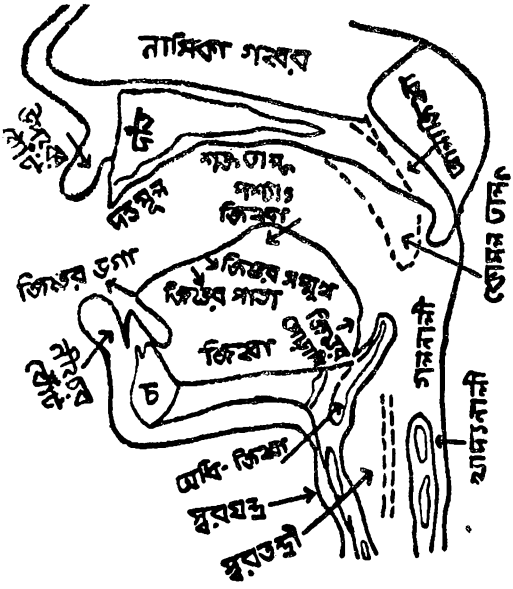

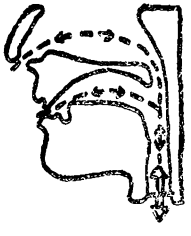

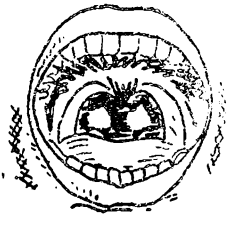

১. স্বরযন্ত্র—Larynx
   ১.ক. স্বরতন্ত্রী—Vocal cord
   ১.খ. গ্লটীস—Glottis
২. শ্বাসনালী—Pharynx
৩. নাসিকাপথ বা নাসারন্ধ্র—Nasal cave or nose pharynx
৪. তালু—Palate
   ৪. ক. সম্মুখ বা শক্ততালু—Front or hard palate
   ৪. খ. পশ্চাৎ বা কোমল তালু—Back or soft palate
   ৪. গ. মূর্ধা—Cerebral
৫. জিহ্বা—Tongue
   ৫. ক. জিহ্বাগ্র—Tip of the tongue
   ৫. খ. জিহ্বার পাতা—Blade of the tongue
   ৫. গ. জিহ্বার সম্মুখ ভাগ—Front of the tongue
   ৫. ঘ. জিহ্বার পশ্চাৎভাগ—Back of the tongue

৬. দন্ত—Teeth
৬. ক. দন্তাগ্র—Teeth tip
৬. খ. দন্তমূল—Teeth ridge
৭. আল জিহ্বা—Uvular
৮. ওষ্ঠ—Lips
৯. মুখ বিবর—Mouth cavity

১. স্বরযন্ত্র (Larynx)

মানুষের গলায়, বিশেষ করে পুরুষ মানুষের গলায় (কেননা, নিতান্ত হ্যাংলা বা স্বাস্থ্যহীন না হলে মেয়েদের গলায় ইহা অশোভন ভাবে বাড়তে দেখা যায় না।) যে উঁচু projection-এর মতো প্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করা যায় তাকে কণ্ঠমণি বা Adam's apple বলা হয়। ভিতরের যন্ত্রপাতিসহ এই কণ্ঠমণি বা উঁচু অংশকে স্বরযন্ত্র বা Larynx বলা হয়। একে আরো শ্রুতিমধুর করে 'ধ্বনি মঞ্জুষা' বা Sound box নামকরণ করা যায়। সমস্ত প্রাণী জগতের মধ্যে একমাত্র মানুষের ধ্বনি মঞ্জুষা বা Larynx-ই সুষ্ঠু ও পূর্ণ।

১. ক. স্বরতন্ত্রী—Vocal cord ও
১. খ. গ্লটীস—Glottis :—

স্বরযন্ত্রের স্বরতন্ত্রী ও গ্লটীসই ধ্বনি উচ্চারণে প্রযুক্ত হয়। স্বরযন্ত্রের মধ্যে আংটির মতো কোমলাস্থির ভিতর দুটো সূক্ষ্ম তন্ত্রী আছে একে বলা হয় স্বরতন্ত্রী।

ক খ

এর আকৃতি কতকটা উল্টো 'ভি' (∧)-এর মতো। ইংরেজীতে একে Vocal cord বলে। আমরা যখন কথা বলি তখন Vocal cordsও ঠোঁটের মতো দ্রুত নড়াচড়া করে। এ দেখে কোন কোন ধ্বনি বৈজ্ঞানিক এ গুলোকে 'স্বরোষ্ঠ' বা vocal lips নামে আখ্যায়িত করেছেন। স্বরতন্ত্রী দুটোর মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় glottis। ফুসফুস থেকে আগত বাতাস মুখ বিবর বা নাসা পথে বের হয়ে যাবার পূর্বে এই স্বরতন্ত্রীর মধ্যবর্তীপথে (glottis) প্রবেশ করে। এবং পর মুহূর্তেই এ দুটোকে প্রকম্পিত করে বেরিয়ে যায়। আবার কোন কোন সময় প্রকম্পিত করে না। তবে এ সময়ে স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যবর্তী পথের (glottis) আকার বিভিন্ন রকম হয় এবং এর সাহায্যে আমরা বাগধ্বনির প্রকৃতি ও রূপ নির্ণয় করতে পারি। Glottis এর বিভিন্নতার আকৃতি নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

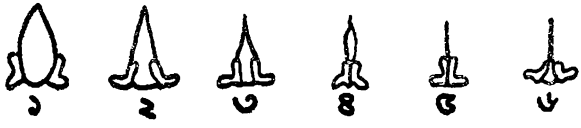
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

বাগধ্বনির প্রকৃতি ও রূপ নির্ণয় ছাড়াও ধ্বনিকে ঘোষতা এবং অ-ঘোষতা গুণে ভূষিত করতেও এরা সাহায্য করে থাকে। ধ্বনি সৃষ্টির কালে এরা যদি বিশেষ ভাবে প্রকম্পিত

হয় তা হলে সে ধ্বনি হবে ঘোষ বা নিনাদিত বা voiced এবং যদি প্রকম্পিত না হয় তাহলে সে ধ্বনি হবে অঘোষ বা অনিনাদিত বা voiceless। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, বাক্‌ধ্বনির উৎপাদন ও তার বিশ্লেষণ বহুলাংশে এই স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভর করে।

২. **শ্বাসনালী** (Pharynx)

বায়ুনালীর কিছু উপরের অংশে জিভের গোড়ায় বা মূলে (root) বা অধিজিহ্বা (epiglottis) বরাবর ঘাড়ের মধ্যকার দেওয়াল সন্নিহিত অংশকে pharynx বা গলনালী বলে। কতকগুলো ধ্বনি উচ্চারণের সময় pharynx-এ চাপ সৃষ্টি করা হয়, সে সব ধ্বনিকে pharyngial sound বলে। তবে আমাদের বাংলা ভাষার কোন ধ্বনি উচ্চারণে বা উৎপাদনে pharynx ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। সাধারণতঃ আরবী ভাষার ح خ ع غ প্রভৃতি ধ্বনি সৃষ্টিতে pharynx সাহায্য করে থাকে।

৩. **নাসিকাপথ বা নাসারন্ধ্র** (Nasal cavity or Nose pharynx)

আলজিহ্বার কিছুটা পেছনে এবং গলকক্ষের উপরে নাসিকা গহ্বর অবস্থিত। এই নাসিকা গহ্বর দিয়ে পৃথিবীর বহুভাষার কতকগুলো ধ্বনি উৎপাদন করা হয়। নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনকালে আলজিহ্বার নীচে কিছুটা কোমল তালু ঝুলে পড়ে, ফলে ফুস্‌ফুস তাড়িত বাতাস সোজা মুখবিবর দিয়ে বের না হয়ে নাসাপথে বের হয়। অন্যদিকে অনুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনায় বের হয়ে আসে বলে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির সংগে এর প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্ট।

৪. **তালু** (Palate)

সম্মুখ বা শক্ততালু (Fornt or Hard palate) দন্তমূলের শেষ অংশ থেকে ভিতরের দিকে অস্থিময় অংশ যেখানে শেষ হয়েছে সেটুকু অংশের নাম শক্ত তালু বা hard palate। শক্ততালুর সবটুকু অংশ অস্থিময় এবং স্থির। ধ্বনি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্যে এই শক্ততালুকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। পশ্চাৎ দন্তমূল (post alveolar) অংশ থেকে শক্ত তালুর আরম্ভ বলে এ অংশকে অগ্রতালু বা pre-palate বলে। এর বিশেষণ অগ্রতালব্য বা অগ্রতালুজাত বা Pre-palatal। এর পরের অংশ শক্ত তালুর মধ্য অংশ mid palate বা মধ্যতালু, বিশেষণে বলা হয়, মধ্যতালুজাত বা মধ্যতালব্য বা mid-palatal। এবং পরবর্তী অংশ শক্ততালুর শেষাংশ বা মূর্ধা বা post palate এর বিশেষণ মূর্ধন্য বা cerebral cacuminal।

শক্ত তালুর এই অস্থি সমন্বিত শক্ত অংশ যেখানে শেষ হয়েছে তারপর থেকেই রয়েছে মাংসল অংশ। এই মাংসল অংশ থেকে আলজিহ্বা পর্যন্ত প্রসৃত অংশই কোমল তালু (soft palate)। শক্ততালু বা সম্মুখ তালুর পিছনের অংশটুকুকে পশ্চাৎতালু বলা হয়। এ অংশটি মাংসল এবং নমনীয় বলে শ্বাস বায়ুর চাপে কিছুটা ওঠানামা করে। বাগধ্বনি সৃষ্টিতে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ধ্বনি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য পশ্চাত্তালুকে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়।

৫. **জিহ্বা** (Tongue)

কথা বলার জন্য উচ্চারণের প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে জিহ্বা অন্যতম প্রধান প্রত্যঙ্গ। ধ্বনি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য জিহ্বাকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়েছে :

ক. জিহ্বার ডগা—tip of the tongue
খ. জিহ্বার পাতা—blade of the tongue
গ. জিহ্বার সম্মুখ ভাগ—front of the tongue
ঘ. জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ—back of the tongue

মুখ খুললেই মুখ গহ্বরের সবচেয়ে নমনীয় অংশ জিহ্বার অগ্রভাগ অর্থাৎ জিহ্বার ডগা (tip of the tongue) আমাদের চোখে পড়ে। জিহ্বার ডগার আধ ইঞ্চি পিছনের অংশকে জিহ্বার পাতা (blade of the tongue) বলে। জিহ্বার পাতার শেষাংশ থেকে ভিতরের দিকে মূর্ধা বরাবর অংশটি জিহ্বার সম্মুখ ভাগ (front of the tongue)। মূর্ধা থেকে পশ্চাত্তালু ও আল জিহ্বার মিলন স্থলের সীমানা বরাবর জিহ্বার এ অংশটিকে জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ (back of the tongue) বলে। ধ্বনি বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য একেও দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন পশ্চাৎ জিহ্বার সম্মুখ ভাগ এবং পশ্চাৎ জিহ্বার পশ্চাদ্‌ভাগ। এর পরে আরো ভিতরের দিকে অগ্রসর হলে আমরা পাব জিহ্বার মূল বা root of the tongue। এই জিহ্বা মূলের সাথেই বায়ুনালীর মুখাবয়ব epiglottis বা অধিজিহ্বা অবস্থিত।

৬. **দন্ত** (Teeth)

মুখমণ্ডলের দুই ঠোঁটের নিচেই দুই পাটি দাঁত চোখে পড়ে। ধ্বনি সৃষ্টিতে দাঁতের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাঁতের পশ্চাৎ দিকে জিহ্বার আঘাতে বহু ধ্বনি উচ্চারিত হয়।

৬. খ. **দন্তমূল** (Alveolar or Teeth-ridge)

উপরের পাটি দাঁতের মাড়িকে বিশুদ্ধ বাংলায় দন্তমূল বলা হয়। বিশেষণে দন্তমূলীয়। ইংরেজীতে দাঁতের মাড়ির নাম teeth-ridge এবং ল্যাটিনে alveolum, বিশেষণে alveolar। দন্তমূলীয়, তালব্য দন্তমূলীয় ও মূর্ধন্য ধ্বনি এখান থেকে উচ্চারিত হয়।

৭. **আলজিহ্বা** (Uvular)

পশ্চাৎ তালুর পেছনে যে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি কোমল পদার্থ ঝুলে থাকে তাকেই আলজিহ্বা বা uvular বলে।

৮. **ওষ্ঠ** (Lips)

ধ্বনি সৃষ্টিতে ওষ্ঠের ভূমিকা কম নয়। বাংলা প—বর্গীয় ধ্বনি ওষ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়। বিশেষণে ওষ্ঠ্য (bilatral)।

৯. **মুখবিবর** (Mouth cavity)

মুখ বিবর যে কি ভাবে ধ্বনি উচ্চারণে সহায়তা করে তা ইতিপূর্বে আমরা মুখবিবরের বিভিন্ন বাক্-প্রত্যঙ্গের আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছি।

তবে একথা ঠিক যে, বাক্-প্রত্যঙ্গের কোন বিশেষ একটির সাহায্যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় না। ফুসফুস তাড়িত বাতাস গলনালী, মুখ বিবর কিংবা নাসাপথ দিয়ে বের হয়ে যাবার সময় কিংবা শ্বাস গ্রহণের সময় বাতাস ভিতরে ঢুকতে গিয়ে উপরোল্লিখিত বাক্-প্রত্যঙ্গগুলোর কোন জায়গায় হয় আটকে গিয়ে, বা বায়ুপথ সংকীর্ণ হবার ফলে চাপা খেয়ে বিভিন্ন ধ্বনির সৃষ্টি করে। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক বাক্-প্রত্যঙ্গের সাহায্য ছাড়া কোন ধ্বনি উচ্চারিত হয়না। কোন্ কোন্ বাক্ প্রত্যঙ্গের সাহায্যে কোন্ কোন্ ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং তাদের কি কি নাম দেওয়া হয়েছে তার একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো।

১. ওষ্ঠ

ক. দুই ঠোঁট বন্ধ করে অথবা খ. নিচের ঠোঁট ওপরের ঠোঁটের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতা জনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সে গুলিকে বলা হয় ওষ্ঠ্য বা filabial ধ্বনি। উদাহরণ : (ক) আমাদের বাংলা প—বর্গীয় ধ্বনি, (খ) আরবী (و) এবং ইংরেজী [w]।

২. দন্তৌষ্ঠ্য

নীচের ঠোঁট উপরের পাটি দাঁতের দিকে উঁচু করার ফলে বায়ুপথের সংকীর্ণতা জনিত যে ধ্বনি পাওয়া যায় সে গুলো দন্তোষ্ঠ (lafio-dental) ধ্বনি। উদাহরণ, ইংরেজী [f,v] ইত্যাদি।

৩. জিহ্বাগ্র

জিহ্বাগ্রভাগ জাত (apical) : ওপর পাটি দাঁতের সংগে জিভের ডগা লাগিয়ে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো dental বা দন্ত্য। উদাহরণ, বাংলা 'ত' 'থ' 'দ' 'ধ'। আর জিভের ডগা দুপাটি দাঁতের মাঝে স্থাপন করার ফলে যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো inter-dental বা অন্তর্দন্ত্য ধ্বনি, উদাহরণ—ইংরেজী th (θ), the (δ)।

৪. দন্তমূল

জিহ্বার ডগা ওপরের পাটি দাঁতের গোড়া বা দন্তমূল স্পর্শ করার জন্য যে সব ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো alveolar বা দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা 'ন' 'র' 'ল', ইংরেজী—[l, d, n, r, s, z]।

৫. মূর্ধা

জিহ্বার ডগা সামান্য পালটে গিয়ে দাঁতের গোড়া স্পর্শ করলে আমরা পাই alveolo-retroflex বা দন্তমূলীয়—মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত ধ্বনি। উদাহরণ, বাংলা ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়। এ গুলোকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে।

৬. পশ্চাৎ দন্তমূলীয়

জিহ্বার পাতা দন্তমূল স্পর্শ করলে আমরা পাই post-alveolar তথা পশ্চাৎ দন্তমূলীয় ধ্বনি। উদাহরণ, বাংলা—'শ'।

৭. অগ্রতালু

জিহ্বার পাতা ও তৎসংলগ্ন সম্মুখ ভাগ পশ্চাৎ দন্তমূল তথা অগ্রতালুকে চেপ্টা ভাবে স্পর্শ করলে পাওয়া যাবে অগ্রতালব্য [pre-palatal] বা প্রশস্তদন্তমূলীয় [dorso-alveolar] ধ্বনি। উদাহরণ,—বাংলা চ, ছ, জ, ঝ।

৮. জিহ্বামূল বা কণ্ঠ

পশ্চাৎ জিহ্বা কোমল তালুকে স্পর্শ করলে পাওয়া যায় জিহ্বামূলীয়, পশ্চাৎ তালুজাত বা কোমল তালুজাত (velar) ধ্বনি। উদাহরণ—বাংলা ক, খ, গ, ঘ, ঙ। এগুলোকে কণ্ঠ্যধ্বনি বলে।

৯. আলজিহ্বা

আলজিহ্বা ও পশ্চাৎ জিহ্বার সংস্পর্শে যে ধ্বনি পাওয়া যায় সেগুলো আলজিহ্বা বা Uvular ধ্বনি। উদাহরণ —ফরাসী, জার্মান [র]।

১০. জিহ্বার গোড়া

জিহ্বার গোড়ালীর সংকোচনের ফলে গলকক্ষে বায়ুপথের সংকীর্ণতা জনিত যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় সেগুলো pharyngial, গলনালীয় বা গলকক্ষীয় ধ্বনি। উদাহরণ আরবী [ح' خ' ع' غ']

১১. স্বরতন্ত্রী

স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয়ের সংস্পর্শজাত ধ্বনির নাম দেওয়া হয় glattal, laryngeal, আন্তঃস্বরযন্ত্র জাত তথা স্বরযন্ত্র মধ্যবর্তী পথজাত কিংবা নিছক guttural বা কণ্ঠমূলীয়। উদাহরণ—বাংলা [হ, ঃ], আরবী [ء]।

৩. বাগধ্বনির শ্রেণী বিভাগ (Classification of speceh sound)

বাগধ্বনি যে কোন ভাষায় অর্থবোধক ধ্বনিরূপে গৃহীত হয়। ধ্বনি অর্থহীনও হতে পারে, কিন্তু তা কোন ভাষার অন্তর্ভুক্তি নয়। বাংলা ভাষায় এই বাগধ্বনি দুই প্রকার : স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

স্বরধ্বনি (Vowel Sounds)

প্রত্যেক ধ্বনির একটা শ্রব্য বা acoustic দিক এবং একটা উচ্চার্য বা articulatory দিক আছে। বক্তা তার নিজের বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি সৃষ্টি করলেও শ্রোতার এবং তার নিজের কানে গিয়ে সমান ভাবে আঘাত করে। এ বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ ধ্বনিবিজ্ঞানী Daniel Jones ধ্বনির গঠনগত physiological দিক থেকে স্বরধ্বনির যে সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন তা নিম্নরূপ[৩] :

"A Vowel (in normal speech) is defined as a Voiced sound, in forming which the air issues in a continuous stream through the pharynx

and mouth, there being no obstruction and no narrowing such as would cause audible friction" (An outline of English phonetics, P. 23 (Heffs, 1950) অর্থাৎ স্বাভাবিক কথাবার্তায় গলনালী ও মুখবিবর দিয়ে ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যাবার সময় কোন জায়গায় বাধা প্রাপ্ত না হয়ে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা না খেয়ে ঘোষবৎ যে ধ্বনি উদগত হয় তা-ই-স্বরধ্বনি। কিন্তু কথাবার্তা যদি অস্বাভাবিক হয় বা ফিসফিস্ (whisper) করে বলা হয় তা হলে সে স্বরধ্বনি অঘোষ হয়ে পড়ে। এতে স্বরযন্ত্রের (larynx) অন্তর্নিহিত স্বরতন্ত্রী (vocal cords)-তে কোন প্রকার কম্পনের সৃষ্টি করে না। ফিসফিসে কথাবার্তায় স্বরতন্ত্রীর মধ্যপথ (glottis) সম্পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত থাকে, এ জন্যে ফুসফুস্ তাড়িত বাতাস নির্গমন কালে স্বরতন্ত্রীতে কম্পন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় না। এই প্রকার স্বরধ্বনিকে কেউ কেউ ফিসফিসে স্বরধ্বনি বা whispared vowel নামে অভিহিত করেছেন।

স্বরধ্বনি বিচারের মাপকাঠি

স্বরধ্বনি বিচার ও বিশ্লেষণের মাপকাঠি মোটামুটি তিনটি।

১. স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তা খুঁজে বের করা।

২. জিহ্বার যে অংশ উঁচু করা হয় তার পরিমাণ অর্থাৎ তা কতটুকু উঁচু হয় তা জানা।

৩. স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থা কেমন থাকে সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

স্বরধ্বনি বিচারের এ তিনটি প্রক্রিয়া থেকে আমরা জানতে পারি যে, কোন ভাষার স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ করতে গিয়ে জিহ্বার সামনের ভাগ কিংবা পেছনের অংশ যথাক্রমে তালুর সামনের বা পিছনের দিকে উচুঁ করতে হয় এবং যে কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে গিয়ে অবস্থা বিশেষে ঠোঁট দুটো হয় নিষ্ক্রিয় থাকে না হয় গোলাকার হয় অথবা প্রস্তৃত হয় ও দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ হয় সংকীর্ণ অথবা প্রশস্ত কিংবা মাঝামাঝি ভাবে মুক্ত থাকে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা 'ই' এবং 'এ' স্বরধ্বনির কথা ধরতে পারি। এ দুটি স্বরধ্বনির তফাৎ আমরা কানে শুনি। 'ই' স্বরধ্বনি উচ্চারণ করতে আমরা জিভের সামনের ভাগকে যে পরিমাণ উঁচু করি তা থেকে জিভের অবস্থান সামান্য নিচু করলেই 'এ' পাই। উচ্চারণ পদ্ধতির দিক থেকে এ দুই স্বরধ্বনির তফাৎ এত অল্প যে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অলসতার ফলে 'ই' স্বরধ্বনি 'এ'-তে এবং 'এ' স্বরধ্বনি 'ই'-তে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্বরধ্বনিসমূহের বিচার বিশ্লেষণ খুব সহজ নয়।

এক ভাষার স্বরধ্বনির মধ্যে একটি থেকে অন্যটি পৃথক করা হয় যেমন জিহ্বার অবস্থা বিচার করে তেমনি ধ্বনিতাত্ত্বিকদের কৌতূহল হলো একটা বিশেষ স্বরধ্বনি রেখে জিহ্বার অবস্থান কতটুকু উঁচু বা নীচু করা যায়, তার পরীক্ষা করা। এ খেয়াল ও কৌতূহল থেকে মোট আটটি মৌলিক স্বরধ্বনির (cardinal vowels) পরিকল্পনা করা হয়েছে। রোমান হরফে সেগুলোর প্রতিলিপি নিম্নরূপ—(১) i (২) e (৩) æ (৪) a (৫) *a* (৬) ɔ (৭) o (৮) u।

এ আটটি মৌলিক স্বরধ্বনি এভাবে নির্দেশ করার কারণ এই যে, উচ্চারণের দিক থেকে যে কোনো একটি ভাষার একটি স্বরধ্বনি তার অব্যবহিত নিকটবর্তী স্বরধ্বনির যেমন খুব কাছাকাছি অবস্থিত হতে পারে, এ মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর যে কোন একটি তার নিকটবর্তী স্বরধ্বনির তত কাছাকাছি নয়। আর সে কারণে উচ্চারণের সময় দুটো শব্দের মধ্যে কাছাকাছি স্বরধ্বনির গোলযোগ হবার সম্ভাবনা কম।

উচ্চারণ পদ্ধতি অনুযায়ী এ গুলোকে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে :

	সম্মুখস্থ	সংবৃত	মৌলিক	স্বরধ্বনি
i	,,	অর্ধসংবৃত	,,	,,
e	,,	,,	,,	,,
æ	,,	অর্ধবিবৃত	,,	,,
a	,,	বিবৃত	,,	,,
ɑ	পশ্চাৎস্থিত	,,	,,	,,
ɔ	,,	অর্ধবিবৃত	,,	,,
o	,,	অর্ধসংবৃত	,,	,,
u	,,	সংবৃত	,,	,,

এ আটটি মৌলিক স্বরধ্বনির প্রত্যেকটির জিহ্বার সঠিক অবস্থান বুঝে নিয়ে এর সঙ্গে তুলনায় যার যার মাতৃভাষার সকল স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান অবহিত হওয়া সহজ হয়। নিম্নে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান দেখনো হলো—

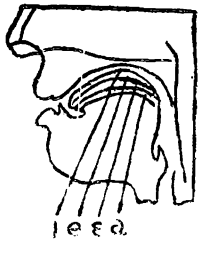

মৌলিক (cardinal) সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান।

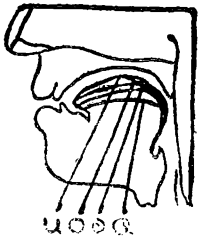

মৌলিক (cardinal) পশ্চাৎ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণে জিহ্বার আনুপাতিক অবস্থান।

একথা স্পষ্ট হয়েছে যে, স্বরধ্বনি উচ্চারণের ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রয়োজনীয় হলো জিহ্বা, ঠোঁট, মুখ বিবর, মাংস পেশীর সংকোচন-প্রসারণ এবং স্বরতন্ত্রীর অবস্থা ও প্রকৃতি। স্বরধ্বনি নির্ণয়ে এগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার বিধি এভাবে বিবৃত করা যেতে পারে।

১. জিহ্বার উচ্চতা।
২. জিহ্বার উচ্চভাগের অবস্থান বা উচ্চতা কতখানি।
৩. জিহ্বার উপরিভাগের প্রকৃতি।
৪. জিহ্বার মাংস পেশী প্রসারিত না সংকুচিত।

৫. ঠোঁটের আকৃতি।
৬. নাসারন্ধ্র খোলা না বন্ধ।
৭. স্বরতন্ত্রী অনুরণিত না স্থির।

বাংলা স্বরধ্বনি

বিশেষ কোন একটি ভাষার মূলধ্বনি নির্ণয় করার জন্যে আধুনিক ধ্বনি বিজ্ঞানের পাঠ প্রতিকল্পন (substitution within a text) প্রথার অনুসরণ করে কতকগুলো শব্দে কেবল স্বরধ্বনি বদলে দিয়ে অর্থাৎ এক স্বরধ্বনির পরিবর্তে অন্য স্বরধ্বনি বসিয়ে বিভিন্ন অর্থ পাওয়া যেতে পারে। এ নিয়মে যে স্বরধ্বনিগুলো পাওয়া যায় তা-ই সে বিশেষ ভাষার মূল স্বর। একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, আন্তর্জাতিক মৌলিক স্বরধ্বনি (cordinal vowel) এবং যে কোন বিশেষ ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে একও হতে পারে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভিন্নও হতে পারে। বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভার থেকে বাছাই করে, একাক্ষরিক (monosyllabic), দ্ব্যক্ষরিক (disyllabic) এবং বহুআক্ষরিক (multi-syllabic) নানা শব্দে স্বরধ্বনি পরিবর্তন করে পাঠ প্রতিকল্পনের মাধ্যমে চলিত বাংলায় আমরা মোট ছ'টি স্বরধ্বনি পাই। এ ছটি স্বরধ্বনি হলো ই, এ, আ, অ, ও, উ। এ ছটি স্বরধ্বনির প্রত্যেকটিই এক একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক একক বা phonological unit কিংবা মূলধ্বনি বা phoneme।

প্রসঙ্গতঃ বাংলা মূল স্বরধ্বনি সম্বন্ধে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত আলোচনা করা যেতে পারে। কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ পণ্ডিত মনে করেন, বাংলা মূল স্বরধ্বনি মোট নয়টি ই, এ, এ্যা, আ[১], আ, অ, ও, ও[১], ঔ।[৪] আবার কেউ কেউ মনে করেন, বাংলা মূল স্বরধ্বনি আটটি, নয়টি নয়। এ ক্ষেত্রে আ[১]-কে একটি আলাদা মূলধ্বনি মনে না করে সাধারণ আ-এরই ভিন্নরূপ মনে করা হয়ে থাকে। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইও এ মতেরই সমর্থক। এ আটটি স্বরধ্বনি হলো : ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও এবং উ।[৫] ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা মূল স্বরধ্বনি সাতটি : ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও এবং উ।[৬] ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও ডক্টর সুকুমার সেন এমতই সমর্থন করেছেন। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এর মতের সমর্থন করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার কারণ তিনি এমতের বিরোধিতা করেননি। তিনি যে ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র মত সমর্থন করেন, তাঁর বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়েছে।[৭]

আমাদের বিশ্লেষণে যন্ত্রলিপি বা kymograph trouing এবং তালু চিত্র বা palatogram-এর সাহচর্যে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারে বিভিন্ন প্রসংগে (contex) ও বিভিন্ন সাহচর্যে (association) যে সব স্বরধ্বনি পাওয়া যায় তাতে ছ'টির বেশী মূল স্বরধ্বনি নেই। যা আছে তা বিশেষ একটি মূল স্বরধ্বনিরই ভিন্ন উচ্চারণ (variant) ; phoneme নয়। যেমন, বর্তমান বাংলাদেশের অনেকের উচ্চারণে আজ, কা'ল, রা'ত (অনেকটা আইজ, কাইল রাইত, এর মতো) প্রভৃতি শব্দে যে 'আ' ধ্বনি শোনা যায়, তা অতিরিক্ত আ' নয়। শব্দের অর্থগত দিক থেকে এ কোন আলাদা অর্থ দ্যোতনা করেনা। সুতরাং উচ্চারণগত পার্থক্য আঞ্চলিক মাত্র মনে করে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইও এটিকে মূলস্বর হিসেবে গ্রহণে নারাজ। একই কারণে ও এবং ও' ধ্বনি দুটোও একই মূল স্বরধ্বনির উচ্চারণ পার্থক্য মনে করা যেতে পারে। বরং ও' ধ্বনিটি অ-ধ্বনির সঙ্গে তুলনীয়।

বিভিন্ন পরিবেশে অ এবং অ' উচ্চারণ পাই। যেমন অনাচার ও অতিশয় শব্দদ্বয়ের অ-এর উচ্চারণে প্রথমটি বিবৃত এবং দ্বিতীয়টি সংবৃত। অ এবং ও' রূপে বিধৃত। এটি অ-এরই বিভিন্ন রূপ। কাজেই এদিক থেকে বিশ্লেষণ করে অ-কে একটি phoneme হিসেবে ধরলেই চলতে পারে। একথা মনে করেই ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অতির অ-কে ও' হিসেবে বিচার করেন নি। এরূপ এ এবং এ্যা সম্বন্ধেও বলা চলে যে, এ দুটোর উচ্চারণ আলাদা হলেও এ দুটো একটি ধ্বনিরই বিভিন্ন রূপ। এ অঞ্চলের উচ্চারণে 'একটি' শব্দের উচ্চারণে অনেকেই এ এবং এ্যা উচ্চারণ করেন। 'এক' শব্দটির 'এ্যাক' উচ্চারণ করেন। আবার 'একটি' শব্দে এ (e) উচ্চারণ করেন।' 'একি' শব্দেতো অবশ্যি এ (e) উচ্চারণ করা হয়। এরূপ 'দেখি' ও 'দেখা' শব্দ দুটোর উচ্চারণে প্রথম শব্দে এ (e) এবং দ্বিতীয় শব্দে এ্যা (æ) পাই। তাই বলে এ দুটো কে কেউ আলাদা phoneme বা phonological unit মনে করেন না। কাজেই এ (e) এবং এ্যা (æ) দুটোকে দুটো মূল স্বরধ্বনি হিসেবে গণ্য না করে, একটি মূলধ্বনি ধরে অপরটিকে তার উচ্চারণ পার্থক্য (variant) মনে করাই বেশী সমীচীন মনে করি। তবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, ভাষাতাত্ত্বিক তাঁর বিশ্লেষণে phonological unit হিসেবে কী ধরণের এবং কী প্রতীক ব্যবহার করবেন তা তাঁর আলোচনার সুবিধা ও বিশ্লেষণ ধারার উপরে নির্ভর করে। এমন কি, বাংলা ভাষায় ই, আ এবং উ কেবল মাত্র এ তিনটি মূল স্বর বা phonological unit ধরেও সম্মুখ মধ্য ও পশ্চাৎ—এ তিন ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

একথা সব ভাষাতত্ত্ববিদই স্বীকার করেছেন যে, বাংলায় হ্রস্বদীর্ঘ কেবল উচ্চারণের সুবিধা ও ছন্দের অনুরোধে হয়ে থাকে। আধুনিক চলিত বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘের কার্যকারিতা (function) ও প্রয়োগ (use) থাকলেও phoneme হিসেবে তার গ্রাহ্যতা ধ্বনিবিজ্ঞানে স্বীকৃতি পায়নি। তাই স্বরধ্বনির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে এস্থলে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি।

এখন আমরা জিভ ও ঠোঁটের অবস্থান, উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যে ও জিহ্বার উচ্চতার নীচতার দিক থেকে স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের যে তিনটি মাপকাঠির কথা উল্লিখিত হয়েছে, সে তিনটি মাপকাঠির আলোকে বাংলার ছ'টি মূলধ্বনি বিবৃত করার চেষ্টা করব।

স্বরধ্বনি বিশ্লেষণের তিনটি মাপ কাঠির আলোকে জিভ ও ঠোঁটের অবস্থানের দিক থেকে বাংলার ছ'টি-স্বরধ্বনি ই, এ, আ, অ, ও এবং উ-এর প্রথম দুটো [১] ই [i] এবং [২] এ [e] সম্মুখ (front) স্বরধ্বনি। ই এবং এ উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার সম্মুখ ভাগ তালুর শক্ত অংশ (hard palate) এর দিকে উঁচু করতে হয়। এ কারণে আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এগুলোকে বলেছেন, তালব্য স্বরধ্বনি। যেখানে জিহ্বার সম্মুখভাগের শেষ এবং পশ্চাৎ ভাগের শুরু মোটামুটি সেখানে আ [a] এর উচ্চারণ স্থান ধরা যেতে পারে। জিহ্বার সম্মুখ ও পশ্চাতের মিলন স্থান থেকে উচ্চারিত হলেও এর প্রবণতা (tendency) পিছনের দিকেই বেশী লক্ষ্য করা যায়। তাই বাংলা 'আ' ধ্বনিটি ইংরেজী central বা neutral vowel (১) কিংবা উর্দু হ্রস্বও সংবৃত (close) আ বা বিবৃত অ-[১] নয়। বাংলা আ [a] জিহ্বার মধ্যকার বিবৃত (open) ধ্বনিরূপে পাওয়া যায়।

(৪) অ [১], (৫)ও [০] এবং (৬) উ [u] পশ্চাৎ (back) স্বরধ্বনি। এ তিনটি স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের পশ্চাৎ ভাগ তালুর নরম অংশের (soft palate) দিকে উঁচু করতে হয়। এ কারণে আমাদের প্রাচীন বৈয়াকরণগণ এগুলোকে বলেছেন, কণ্ঠ্যস্বরধ্বনি।

জিহ্বা উঁচু করার দিক থেকে (১) 'ই' [i] সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (close front vowel) এবং (২) এ [e] অর্ধ সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি (half close front vowel)। (৩) আ [a] সম্মুখ ও পশ্চাতের মাঝামাঝি বিবৃত স্বরধ্বনি (mid open vowel)। (৪) অ (১) অর্ধ বিবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (half open back vowel)। (৫) ও [o] অর্ধ সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (half close back vowel) এবং (৬) উ [u] সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (close back vowel)।

স্বরধ্বনি বিচারের তৃতীয় মাপকাঠি ঠোঁটের অবস্থান ও আকৃতির দিক থেকে বাংলা স্বরধ্বনি (১) ই [i] উচ্চারণের সময় ঠোঁট ঈষৎ প্রসৃত কিংবা নিরপেক্ষ (neutral) থাকে, (২) এ [e] উচ্চারণের সময় অর্ধ প্রসৃত বা ঈষৎ প্রসৃত, (৩) আ [a] উচ্চারণের সময় নিরপেক্ষ (neutral), চোয়াল মাঝামাঝি থেকে কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, (৪) অ (১), উচ্চারণের সময় ঠোঁট দুটো বেশ খোলা ও গোলাকার থাকে, (৫) ও [o] উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোল হয়ে সামনে বেড়ে যায় এবং বাতাস বেরুবার পথটি (৪) 'অ' [ɔ] উচ্চারণের সময় যতখানি বিবৃত হয়, এ ক্ষেত্রে তারচেয়ে সংকীর্ণ হয়। আর (৬) উ [u] উচ্চারণের সময় ঠোঁট যথাসম্ভব গোল হয়ে সামনে বেড়ে যায়, মাঝপথের ফাঁক সরু হয়।

এবারে আমরা বাংলা বিভিন্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন্ অংশ উঁচু হয়, কত খানি উঁচু হয় এবং ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা কেমন থাকে তার বিশদ বিবৃতি দিতে চেষ্টা করব।

১. ই (i) সংবৃত ও অর্ধ সংবৃতের মাঝামাঝি সাধারণ অগোল সম্মুখ স্বরধ্বনি (front unrounded vowel between close and half-close)।

ই (i) উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখ ভাগ (front of the toungue) তালুর শক্ত অংশ (hard palate)-এর দিকে উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতা সংবৃত ও (close) অর্ধ-সংবৃত (half close) এ দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, ঠোঁট ঈষৎ প্রসৃত (spread) কিংবা নিরপেক্ষ (neutral) বা স্বাভাবিক (normal) থাকে এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ সংকীর্ণ (the opening between the jaus is narrow) হয়। উদাহরণ: ইট (it), তিন (tin), তিনি (tini)। লক্ষণীয়: ই (i) এই সংবৃত ও অর্ধ সংবৃত মাঝামাঝি সাধারণ সম্মুখ স্বরধ্বনিটির একটি বিকল্প ধ্বনি পাওয়া যায় পুরোপুরি সংবৃত হিসেবে। যেমন, দিই শব্দের ই (i) পুরোপুরি সংবৃত।

২. এ (e) অর্ধ সংবৃত ও অর্ধ বিবৃতের মাঝামাঝি অগোল সম্মুখ স্বরধ্বনি (front unround vowel between half close and half open)।

এ (e) উচ্চারণের সময় জিহ্বার সম্মুখ ভাগ (the front of the tongue) তালুর শক্ত অংশ (hard palate) এর দিকে উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতা অর্ধ সংবৃত (half close) ও অর্ধ-বিবৃতের (half open) মাঝামাঝি অবস্থার থাকে, ঠোঁট-সামান্য প্রসৃত কিংবা নিরপেক্ষ (neutral) থাকে এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ একেবারে সংকীর্ণও নয়, একেবারে খোলাও নয়, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে (the opening between the jaws is medium)।

উদাহরণ: এমন (emon), দেশ (deʃ), দেশে (deʃe)।

উল্লেখ্য, এ (e) এই অর্ধ সংবৃত ও অর্ধ বিবৃতের মাঝামাঝি অগোল সম্মুখ ধ্বনিটি বিশেষ পরিবেশে পুরোপুরি অর্ধ সংবৃত (half-close) ধ্বনি হিসেবেও পাওয়া যায়।

যেমন, দেই (dei) ক্রিয়াপদের 'এ' (e) কিংবা দেশী পদের 'এ' (e) অর্ধসংবৃত (half-close) স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।

এ (e) এই অর্ধ সংবৃত ও অর্ধ-বিবৃতের মাঝামাঝি অগোল সম্মুখ ধ্বনিটি বিশেষ পরিবেশে অর্ধ বিবৃত (half-open) ধ্বনি হিসেবেও পাওয়া যায়। যেমন, এক (æk) কিংবা দেখা (dækha) শব্দের এ (e) এ উচ্চারণে অর্ধ বিবৃত (half-open) স্বরধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।[২] শব্দের উচ্চারণে 'এ (e) সংবৃত'।

এই অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনিটিকে অনেকেই একটি আলাদা স্বরধ্বনি (phone বা phonological unit) হিসেবে গণ্য করছেন[৮] কিন্তু এটি প্রকৃত প্রস্তাবে পরিবেশ প্রভাবে বিকল্প ধ্বনি যেমন √দেখ ধাতুরূপ 'দেখা' শব্দের উচ্চারণে এ (e) অর্ধ বিবৃত; 'দেখি' শব্দের উচ্চারণে এ (e) অর্ধ সংবৃত।

৩. আ (a) বিবৃত, অগোল, সম্মুখ ও পশ্চাতের মাঝামাঝি স্বরধ্বনি (unrounded open vowel neither front nor back)।

আ (a) এর উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাতের সম্মুখ ভাগ (front of the back of the tongue) তালুর দিকে উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতা বিবৃত এবং ঠোঁট-নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ একেবারে সংকীর্ণও নয়, একেবারে খোলাও নয়, মাঝামাঝি (medium) অবস্থায় থাকে (the opening between the jaws is medium to wide)।

উদাহরণ : আনা [ana], ডানা [dana], মলিনা [molina]।

৪. অ (ɔ) বিবৃত ও অর্ধবিবৃতের মাঝামাঝি গোল পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (back rounded vowel between half open and open)।

অ (ɔ) উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাৎভাগ (beck of the tougue) তালুর দিকে উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতা বিবৃত ও অর্ধ বিবৃতের মাঝামাঝি (between open and half open), ঠোঁট গোল হয় (rounded), দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ মাঝামাঝি (medium) খোলা থাকে।

উদাহরণ : অনেক [ɔnek], বলা [bɔla], জাত [jatɔ]।

দ্রষ্টব্য : অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই পারিভাষিক দিক থেকে ধ্বনিটি বিবৃত ও কুঞ্চিতের মাঝামাঝি (between open and close lip rounded) বলে উল্লেখ করেছেন।

লক্ষণীয় : অ [ɔ] ধ্বনির বিকল্প সংবৃত অ ['o] রূপেও উচ্চারিত হয়। যেমন, অতি অতুল এসব শব্দের 'অ'-এর উচ্চারণ অনেকটা ও [o]-এর মতো কিন্তু এটি অ [ɔ]-এর-একটি রকম ফের মাত্র। এটিকে একটি আলাদা Phoneme বা Phonological unit বলে ধরে নেয়া যায় না।[৯]

৫. ও (o) অর্ধ-সংবৃত ও অর্ধ বিবৃতের মাঝামাঝি গোল পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (back rounded vowel between half-close and half open)।

ও [o] উচ্চারণের সময় জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ (back of the tongue) তালুর দিকে উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতা অর্ধ সংবৃত (half close) ও অর্ধ বিবৃতের (half-open) মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, ঠোঁট বেশ গোল হয় কিন্তু ছুঁচোলো হয়ে সামনে বেড়ে যায় না। এবং দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথ একেবারে সংকীর্ণও নয়, একেবারে খোলাও নয়, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে (the opening between the jaws is medium)।

উদাহরণ : ওজন [ojɔn], দোলন [dolɔn], বুনো [bunɔ]।

দ্রষ্টব্য : বাংলা অ [ɔ] এবং ও [o] এর মাঝামাঝি ও' ['o] ধ্বনিকে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই আলাদা একটি phoneme or phonological unit মনে করেছেন।[১০] ও' ['o] উচ্চারণে ও [o]-এর তুলনায় ঠোঁট দুটো অপেক্ষাকৃত কম গোল হয়, অর্থাৎ অ [ɔ] এর দিকেই ঝোঁক থাকে বেশী ; দু চোয়ালের মাঝে ফাঁকের তেমন তারতম্য হয় না। ও' ['o] এর উচ্চারণে জিভের পশ্চাৎভাগ ও [o] এর মতো উচুঁ হয় না ; অ [ɔ] উচ্চারণের কাছাকাছি হয়। জিভের পশ্চাৎ ভাগের যে অংশ থেকে ও [o] উচ্চারিত হয় তার গতি কিছুটা দ্রুত সম্মুখগামী হয়। এজন্যই ও' ['o] কে সিকি সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই উল্লেখ করেছেন। তিনি সত্যি বলেছেন যে, সূক্ষ্মধ্বনি বিচারে জিভের পশ্চাৎ ভাগের সাহায্যে উচ্চারিত এ-ধ্বনি রূপকে yotized [oʸ] বলা যেতে পারে। বাংলায় এ ধ্বনিটির অভিশ্রুত ও' [y] নামকরণ ও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু এটি কোন কোন ক্ষেত্রে অ [ɔ] ধ্বনির বিকল্প (alternant), যেমন, ওঠ [otho] । (othɔ) শব্দের অন্ত্যস্বরের উচ্চারণ অ [ɔ] না হয়ে যদি ও [o]-এর মতো বা তার কাছাকাছি হয়, তবে তার উচ্চারণ হয় অনেকটা ও [o]-এর মতো, ওঠো (otho) এ (phonex) আরও একটি বিকল্প উচ্চারণ পাওয়া যায় ভবিষ্যৎ কালের মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞার ক্রিয়াপদে। সেখানে ওঠো (otho) না হয়ে প্রথম স্বরধ্বনি একটু উচুঁতে গিয়ে উ [u]-এর মতো বা তার কাছাকাছি উচ্চারিত হয়ে শেষের দিকের অন্ত্যস্বরের উচ্চারণ সাধারণ ও [o]-এর থেকেও উপরে টেনে নেয়। উচ্চারণটি অনেকটা উঠিও > উঠো (utho) > 'উঠিও (uthio)-এর মতো উচ্চারিত হতে গিয়ে উঠো (utho) উচ্চারিত হয়। কিন্তু কোন ক্রমেই ওঠো (otho) কিংবা উঠু (uthu) হয় না। এসব কথা বিবেচনা করে ও' ['o] বা অভিশ্রুত 'ও-কে আলাদা 'ফোনেম' বা 'ফনলজিকেল একক' হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে না। বরং এটি সহগামিতা (association), পরিবেশ ও অব্যবহিত উপাদান বা Immediate constituent-এর প্রসংগ অনুযায়ী অ [ɔ] (যেমন, অতুল (otul)-এর প্রথম অক্ষরের স্বর-ধ্বনি অথবা কত (kɔto) শব্দের অন্ত্যঅক্ষরের স্বর-ধ্বনি) কিংবা ও [o]-এর কিংবা উ [u]-এর ধ্বনি-বিকল্প (alternant)বা সহধ্বনি (allophone)।

৬. উ [u] সংবৃত ও অর্ধসংবৃতের মাঝামাঝি সম্পূর্ণ গোল পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (Back rounded vowel between close and half-close)।

উ [u] উচ্চারণের সময় জিহ্বার পিছন ভাগ (back of the tongue) তালুর দিকে উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতা সংবৃত (close) ও অর্ধসংবৃত (half-close)-এ দুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে, ঠোঁট গোল হয় এবং ইষৎ ছুচোলো হয়ে কিঞ্চিত সামনে বেড়ে যায় (rounded with protrusion)। দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী পথের ফাঁক সংকীর্ণ হয় (opening between the jaws is narrow)। উদাহরণ : উট [ut], তুমি [tumi], গুরু [guru]।

দ্রষ্টব্য : অ [ɔ] এবং ও [o] মূল ধ্বনির যেমন নানা পরিবেশ বিভিন্ন সহধ্বনি বা allophones-এর প্রমাণ পাওয়া যায়, তেমনি উ [u]-এরও বিভিন্ন allophone বা সহধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন, তুলি (tuli) ও তুলুন (tulun) শব্দের প্রথম অক্ষরের উ [u] স্বর যতখানি সংবৃত 'তুলে' (tule) অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রথম অক্ষরের উ [u] স্বরধ্বনি তার চাইতে বেশী সংবৃত। আবার 'তোল' (tol) শব্দের একমাত্র অক্ষরের উচ্চারণে উ [u] না হয়ে একেবারে ও [o] এর কাছাকাছি কিংবা সম্পূর্ণ ও [o] হয়।

বাংলা মোট ছ'টি স্বরধ্বনি ই (i), এ (e) আ (a), অ (ɔ) ও (o) এবং উ (u)। বিভিন্ন পরিবেশে এ সব ধ্বনির বিভিন্ন সহ থাকে।

বাংলা স্বরধ্বনিগুলো মৌলিক স্বরধ্বনির (cardinal vowel) তুলনায় স্থান নির্দেশ এভাবে করা যেতে পারে।

১. বাংলা ই (i) মৌলিক স্বরধ্বনি ই (i) এবং এ (e)-এর মাঝামাঝি।

২. বাংলা এ (e) মৌলিক স্বরধ্বনি এ (e) এবং আ (a)-এর মাঝামাঝি অর্থাৎ নীচের সম্মুখ ধ্বনি আ (a)-এর উপরে বিবৃত ও অর্ধবিবৃত সম্মুখ-ধ্বনি এ্যা (æ) সহ।

৩. বাংলা আ (a) মৌলিক স্বরধ্বনি সম্মুখ আ (a) এবং পশ্চাৎ আ (a)-এর মাঝামাঝি।

৪. বাংলা অ (ɔ) মৌলিক পশ্চাৎ বিবৃত স্বরধ্বনি আ (a) এবং পশ্চাৎ অর্ধ-বিবৃত স্বধ্বনি (ɔ)-এর মাঝামাঝি।

৫. বাংলা ও (o) মৌলিক পশ্চাৎ অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি অ (ɔ) এবং পশ্চাৎ অর্ধ-সংবৃত ও (o) ধ্বনির মাঝামাঝি।

৬. বাংলা উ (u) মৌলিক পশ্চাৎ অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি ও (o) এবং পশ্চাৎ সংবৃত স্বরধ্বনি উ (u)-এর মাঝামাঝি।

মৌলিক সম্মুখ ও পশ্চাৎ স্বরধ্বনি (cardinal front ও back vowel)-গুলো উচ্চারণে জিহ্বার যে আকৃতি হয় তা একটি রেখাচিত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি ই (i) উচ্চারণে জিহ্বার সম্মুখের যে অংশ উঁচু হয়, এ (e), এ্যা (æ) ও আ (a) উচ্চারণে তার অবস্থান সমমাপের ব্যবধানে ক্রমেই নিম্নগামী হয়। আবার সংবৃত পশ্চাৎ স্বরধ্বনি উ(u) উচ্চারণে জিহ্বার পশ্চাতের যে অংশ উঁচু হয়, ও (o), অ (ɔ) এবং আ (a) উচ্চারণে তার অবস্থান সমমাপের ব্যবধানে ক্রমেই নিম্নগামী হয়। মৌলিক স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার সম্মুখ ও পশ্চাৎ ভাগের অবস্থান নিম্নরূপ রেখা চিত্রে দেখানো যায় :

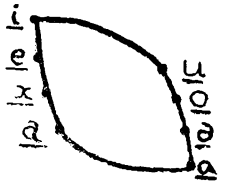

আন্তর্জাতিক ধ্বনিবিজ্ঞান সমিতি, ১৯৬৭, কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি অনুযায়ী বৃটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী ড্যানিয়েল জোনস্ অনুসৃত নীতিমালা অনুসারে, মৌলিক স্বরধ্বনি গুলোর শ্রুতিগত সমমাপের এ দূরত্বকে সরলরৈখিক একটি নকশায় এভাবে দেখানো যায়—

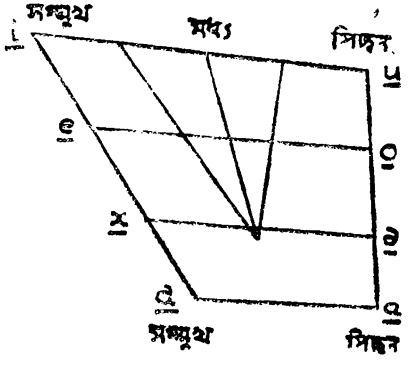

মৌলিক স্বরধ্বনির অবস্থান বিচারে বাংলা স্বরধ্বনি গুলোর অবস্থান নিম্নরূপে দেখনো যেতে পারে—

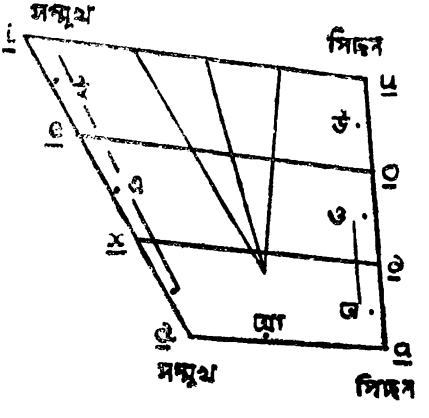

স্বরধ্বনির পার্থক্য নির্ণয়ে অধুনা ধ্বনিবিজ্ঞানী নানা স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যনির্ভর পদ্ধতির প্রয়োগ করছেন। ইয়াকবসন (Jacobson) ও তাঁর অনুসারীরা শ্রুতিগত বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্বনিগুলোর প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। এ রীতি অনুসারে ধনাত্মক প্রতীক (+) এবং ঋনাত্মক প্রতীক (—) ব্যবহার করে, যে যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তার জন্য (+) প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে, এবং যে যে বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তা বুঝানোর জন্য(—) প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, (ই) উচচ ধ্বনি সুতরাং '+' এবং (ই) নিম্ন ধ্বনি নয় সুতরাং '—' ব্যবহার করা হবে; অনুরূপভাবে (ই) গোলাকার নয় সুতরাং(—) চিহ্ন এবং (ই) অগোলাকার সুতরাং (+) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রয়োগে মৌলিক স্বরধ্বনি গুলোর একটি রেখাচিত্র নিম্নরূপে অঙ্কন করা যেতে পারে।

↓ বৈশিষ্ট্য-ধ্বনি →	ই	এ	এ্যা	আ'	আ	অ	ও	উ
সম্মুখ	+	+	+	+	—	—	—	—
পশ্চাৎ	—	—	—	—	+	+	+	+
মধ্য	—	—	—	—	—	—	—	—
উচচ	+	—	—	—	—	—	—	+
উচচ মধ্য		+					+	
নিম্ন মধ্য	—	—	+	—	—	+	—	—
নিম্ন	—	—	—	+	+	—	—	—
গোলাকার	—	—	—	—	—	+	+	+
অগোলাকার	+	+	+	+	+	—	—	—
সংবৃত	+	—	—	—	—	—	—	+
অর্ধ-সংবৃত	—	+	—	—	—	—	+	—
অর্ধ-বিবৃত	—	—	+	—	—	+	—	—
বিবৃত	—	—	—	+	+	—	—	—

উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণে বাংলা স্বরধ্বনি গুলোর একটি রেখাচিত্র নিম্নে দেওয়া হলো।

			১	২	৩	৪	৫	৬
	বৈশিষ্ট্যে ↓	স্বরধ্বনি →	ই	এ	আ	অ	ও	উ
১	সম্মুখ		+	+	—	—	—	—
২	পশ্চাৎ		—	—	—	+	+	+
৩	মধ্য		—	—	+	—	—	—
৪	উচ্চ ও উচ্চ-মধ্যের মাঝামাঝি		+	—	—	—	—	+
৫	উচ্চ-মধ্য, নিম্নের মাঝামাঝি		—	+	—	—	+	—
৬	নিম্ন মধ্য ও নিম্নের মাঝামাঝি		—	—	+	—	—	—
৭	নিম্ন		—	—	—	—	—	—
৮	গোলাকার		—	—	—	+	+	+
৯	অগোলাকার		+	+	+	—	—	—
১০	সংবৃত		+	—	—	—	—	+
১১	অর্ধ-সংবৃত		—	+	—	—	+	—
১২	অর্ধ-বিবৃত		—	—	—	+	—	—
১৩	বিবৃত		—	—	+	—	—	—
১৪	ঘোষ		+	+	+	+	+	+
১৫	অঘোষ		—	—	—	—	—	—
১৬	মৌখিক		+	+	+	+	+	+
১৭	নাসিক্য		—	—	—	—	—	—

লক্ষণীয় যে, স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রী (vocal cord) অনুরণিত হয়। তাই এ ধ্বনিগুলোকে বলা হয় ঘোষ। কদাচিৎ কোন সন্নিহিত উপাদানের প্রভাবে অঘোষ উচ্চারিত হতে পারে মাত্র।

অনুরূপ ভাবে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় আল জিহ্বা উপরে উঠে এবং নাসারন্ধ্র বন্ধ থাকে। তাই এ ধ্বনিগুলোকে বলা হয় মৌখিক, নাসিক্য বা অনুনাসিক্য নয়। তবে বাংলা স্বরধ্বনির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলো মৌখিক ও নাসিক্য উভয় রকমেই উচ্চারিত হতে পারে। কিন্তু এ 'নাসিক্যতা' শব্দের অর্থ-প্রকাশে অনেক সময় কোন তারতম্য ঘটায় না। তাই 'নাসিক্যতা' ও 'অনাসিক্যতা' আলাদা 'মরফিম' বা 'ফনলজিকেল ইউনিট' বলে স্বীকৃতি চায়না। (১) বাংলা স্বরধ্বনি মৌখিক ও নাসিক্য দুই-ই হতে পারে তার উদাহরণ : ই, ইঁ, / এ, এঁ, /আ আঁ, / অ, অঁ/ ও, ওঁ / উ, উঁ /।

শব্দের উদাহরণ : আকা-আঁকা, পাক-পাঁক। প্রকৃত প্রস্তাবে নাসিক্য ও মৌখিক স্বরের একক ধ্বনির মধ্যে ফোনেমিক পার্থক্য না দেখা গেলেও, মূলতঃ অর্থগত পার্থক্য দ্যোতনার জন্য নাসিক্য স্বর ব্যবহৃত হয়। যেমন / পাক / এবং / পাঁক / শব্দ দুটোর উচ্চারণ পার্থক্যে অর্থেরও পার্থক্য করে দিয়েছে।

অর্ধস্বরধ্বনি—Semi or half Vowel

বাংলাতে মূল স্বরধ্বনি ছাড়াও কয়েকটি অর্ধস্বরধ্বনি আছে। এ গুলোর পারিভাষিক নাম Semi Vowel। খুব বিজ্ঞানোচিত নয় বলে ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এ নামটি পুরোপুরি মেনে নিতে চান না। আমরা যে বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে semi vowel নামটি উপস্থাপিত করেছি ঠিক সে অর্থেই semi consonant নামটিও যুক্তিযুক্ত।

অর্ধস্বরধনি, দ্বিস্বরধ্বনি ((diphthong)) এবং ভাষাবিশেষের অর্ধস্বর ও দ্বিস্বর তথা দ্বৈত স্বরধ্বনির সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত জটিল বিষয়। এবং সে জন্যেই বিশেষত অর্ধস্বরধ্বনির তত্ত্ব ও সংজ্ঞা নিয়ে আটলান্টিকের উভয় পারের ধ্বনিবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখতে পাওয়া যায়। অর্ধস্বরধ্বনির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ব্রিটিশ ধ্বনিবিজ্ঞানী Daniel Jones বলেন—

> "Semi Vowel : a Voiced gliding sound in which the speech organs start by producing a vowel of comparatively small prominence and immediately change to a more prominent vowel. Examples English ; J (as in yard), W (as in one : WAN). An outline of English phonetics, 1950, P-47.। এবং আমেরিকার ধ্বনি বিজ্ঞানী Block এবং Trager বলেন—"A Sequence of sounds in a normal utterance is characterised by successive peaks and valleys of sonority. The sounds which constitute the peaks of sonority are called syllabic ; and the utterance has as many syllables as it contains syllabic sounds.
>
> The decisive factor is usually the distribution of the stress—whether each vowel is pronounced with a separate impulse of stress or whether a single impulse extends over both. In the latter case, either the first or the second Vowel may be the more sonorous and act as the peak of the syllable ; the other is said to be non-syllabic.....

"...If we examine a large number of dipthongs, we find that in unmytypical cases as in high (hai), how (hau), go (gou), boy (boi), the non syllabic Vowel has a higher tongue position than the syllabic. In view of what we have said about sonority, this is not surprising. It is useful to have a special name for a non-syllabic vowel with this kind of relation to the contiguous syllabic we call it a semi-vowel. The semi-vowel many precede as well as follow a vowel."

Bernard Block, George. L. Trager : Outline of Linguistic Analysis, p. 22—23।

ব্রিটিশ ধ্বনি বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে অর্ধস্বরধ্বনি এমন একটি gliding sound অর্থাৎ শ্রুতি বা পিচ্ছিল ধ্বনি যা উচ্চারণ করতে গেলে জিহ্বার গতি উচ্চ ও সংকীর্ণতর একটি স্বরধ্বনির দিক থেকে প্রশস্ততর অন্য একটি স্বরধ্বনির দিকে এগিয়ে যায়। তাঁরা বলেন, জিহ্বার গতিশীলতা ও তৎসংশ্লিষ্ট একটি অসম্পূর্ণ স্বরধ্বনির সমষ্টিই অর্ধস্বরধ্বনি। উদাহরণ স্বরূপ ইংরেজি অর্ধস্বরধ্বনি j (তুলনীয় yard : jaid) এবং w-এর সামগ্রিক উচ্চারণ প্রক্রিয়াটিই অর্ধস্বরধ্বনি।

ইংরেজ ধ্বনি বিজ্ঞানীদের সংজ্ঞা বিচার করলে কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে—

(a) জিহ্বার অবস্থানের দিক থেকে অর্ধস্বরধ্বনির নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই।

(b) উচ্চারণ কালের (সময়ের) দিক থেকে তার স্থিতিকাল অত্যন্ত অল্প অর্থাৎ মুখের মধ্যে ধ্বনিটি তৈরী হতে না হতেই উচ্চারিত হয়ে যায়।

(c) এ সকল অর্ধসরধ্বনির তুলনায় তার পূর্বের কি পরের স্বরধ্বনি অনেক বেশী অনুরণিত। এ কারণে যে কোন একটি পূর্ণ স্বরধ্বনির তুলনায় তার অর্ধস্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার রূপ উচ্চতর এবং বায়ুপথ সংকীর্ণতর হয়। অর্ধস্বর দিয়ে বাংলাতে খুব বেশী শব্দ বা অক্ষর সূচনা হয় না। বিদেশী 'ইয়ার' 'এয়াড়', 'ইয়োরোপ', 'ওয়াড়' ইত্যাদি শব্দে ছাড়া মোটেও হয় কিনা তা বিতর্কের বিষয়।

শব্দের মধ্যে দুই স্বরের মাঝখানে অথবা এক শব্দের শেষে ও পরবর্তী শব্দের আদিতে পাশাপাশি একই স্বরধ্বনি থাকলে এক সংগে উচ্চারণ করতে বাগযন্ত্রের অসুবিধা হয়। এই অসুবিধার মধ্যে যে অস্পষ্ট অন্তবর্তী ধ্বনি উত্থিত হয়, সেই gliding ধ্বনিগুলোই যথার্থ অর্ধস্বরধ্বনি।

প্রাচীন বৈয়াকরণদের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুযায়ী বাংলায় 'য়' শ্রুতি এবং অন্তঃস্থ 'ব' শ্রুতির যথেষ্ট প্রয়োগ পাওয়া যায়। বাংলা বর্ণমালায় এই 'ব'-এর স্বতন্ত্র কোনো রূপ নেই। এ ছাড়া বাংলা বর্ণমালায় নেই অথচ ধ্বনি হিসেবে আর একটা অর্ধস্বরধ্বনি পাওয়া যায় যাকে 'ই'-শ্রুতি বলা হয়। এ তিনটিকে রোমান প্রতিলিপিতে y, w এবং j রূপে দেখানো যেতে পারে। বাংলায় পায়া, মায়া, মেয়ে, নেয়ে, ছেলে, দেয়ে, চেয়ে প্রভৃতি শব্দের প্রথম এবং শেষ স্বরধ্বনি যেমন পা-এর-'া' এবং য়া-এর 'া'। এই দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে মুখ বিবর ও জিহ্বার অস্বস্তিজনিত একটা পিচ্ছিল (gliding) ধ্বনি অত্যন্ত অল্পক্ষণের জন্যে (হয়ত এক সেকেণ্ডের একশো ভাগের একভাগ কাল পরিমাণের

জন্যই) উত্থিত হচ্ছে। স্বরধ্বনি জাতীয় এ পিচ্ছিলতাটুকুই তার পরবর্তী ধ্বনিটির সহযোগে এখানকার অর্ধস্বরধ্বনি 'য়', এমনিভাবে মোয়া, কূয়া, হওয়া, নাওয়া, প্রভৃতি শব্দে অন্তঃস্থ 'ব' এবং দ্রুত কথাবার্তায় 'পিউ', গিয়া, নিয়া, প্রভৃতি শব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরের মাঝখানে 'ই' জাতীয় একটা অর্ধস্বরধ্বনি উত্থিত হয়।

এমেরিকান ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর ফার্গুসন এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বাংলায় চারটি অর্ধস্বর পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন : ই (i), এ (e), ও (o) এবং উ (u)। কিন্তু উ (u) অর্ধস্বর হিসেবে কোন ন্যূনতম জোড় বা (minimal pair) দেখাননি। কাজেই মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে বাংলায় ই, এ, এবং ও এ-তিনটি শ্রুতিই পাওয়া যাবে। যেমন যাই [jai] যায় [Jac] এবং যাও [jao] শব্দের দ্রুত উচ্চারণে পাওয়া যায়।

সন্ধ্যক্ষর বা দ্বিস্বরধ্বনি বা যৌগিক স্বরধ্বনি—Diphthong

'একটি মাত্র স্বরধ্বনি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে তাহার মধ্যে দুইটি স্বরধ্বনি উচ্চারিত হইলে দ্বিস্বরধ্বনি বা সন্ধ্যক্ষর (diphthong) হয়।'-(ড. সুকুমার সেন)

পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনির এক অক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হওয়াই এর প্রথম শর্ত। কিন্তু এক নিশ্বাসের দুইবারের স্বতন্ত্র চেষ্টায় (by two separate breath-pulses) দুই স্বর পাশাপাশি উচ্চারিত হলে তা আর দ্বিস্বরধ্বনি থাকেনা। যেমন 'যাই' পড়তে গিয়ে যদি যা-ই (whatever অর্থে) উচ্চারণ করি তাহলে দ্বিস্বরধ্বনি হবে না, অথচ এক নিশ্বাসে 'যাই' উচ্চারিত হলে তা দ্বিস্বরধ্বনি। তা ছাড়া প্রথম স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে জিহ্বা একটা নির্দিষ্ট ঠাঁই নেয় এবং সাধারণ স্বরধ্বনি উচ্চারণ কালে এরকম ক্ষেত্রে জিহ্বা যতটুকু সময় অপেক্ষা করতো এতটুকু অপেক্ষা না করেই পরবর্তী স্বরধ্বনির দিকে দ্রুত এগিয়ে (পিছলে) যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরবর্তী স্বরধ্বনি মুখের মধ্যে পরিস্কার রূপ গ্রহণ করতে পারে না। এইভাবে প্রথম ও দ্বিতীয় স্বরধ্বনির মাঝে একটা পিচ্ছিল শ্রুতিধ্বনি (gliding sound) উৎপন্ন হয়। এটিকে আমরা 'স্বয়ম্ভু পিচ্ছিল ধ্বনি' (an independent glide expressly made)-ও বলতে পারি। "তা হলে একটি স্বরধ্বনি জিহ্বার গতিশীলতা এবং তৎপরবর্তী সামগ্রিক প্রক্রিয়াসৃষ্ট অর্ধস্বরধ্বনি সমন্বয়ে জাত একটি অক্ষর (syllable)-কেই diphthong বলা যেতে পারে।"

একমাত্র ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনা কালেই আমরা আমাদের বাংলা বর্ণমালার অপূর্ণতা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনিজ্ঞাপক বর্ণ (letter) পাই মাত্র দুটি। যথা, 'ঐ' এবং 'ঔ' কিন্তু বাংলা ধ্বনিগত (phonetic) দিক থেকে পাই ৩১টি যৌগিক স্বরধ্বনি। এরমধ্যে ১৯টি নিয়মিত (regular) এবং ১২টি অনিয়মিত (irregular)।[১১]

নিম্নে ১৯টি নিয়মিত সন্ধ্যক্ষরের উদাহরণ দেওয়া হলো। সতর্ক বা অসতর্ক যে কোন ভাবেই উচ্চারণ করা যাক না কেন এদের গুণ অক্ষুণ্ণ রইবে। যথা—

মূলস্বর 'ই' দিয়ে—

১. ই-ই্ (i-i)—যেমন, দিই্, করিই্।
২. ই-উ্(iu)—যেমন, পিউ্, মিউ্।

মূলস্বর 'এ' দিয়ে—

৩. এই্ (ei)—যেমন, এই্, সেই্, খেই্, দেই্।
৪. এও্ (eo)-যেমন, মেও্, কেও্, নেও্, পেও।
৫. এউ্ (eu)--যেমন, ঘেউ্ঘেউ্, কেউ্ কেউ্।

মূলস্বর 'এ্যা' দিয়ে—

৬. এ্যাও্ (æo)—যেমন, দ্যাও্, ন্যাও্, ম্যাও।
৭. এ্যায়্ (æy)--যেমন, ন্যায়, দ্যায়।

মূলস্বর 'আ' দিয়ে—

৮. আই্ (ai)—যেমন, খাই, দাই, যাই, পাই, নাই।
৯. আও্ (ao)—যেমন, দাও্, খাও্, যাও্, পাও্, ফাও্।
১০. আউ্ (au)—যেমন, দাউ্ দাউ্।
১১. আয়্ (ay)--যেমন, আয়্ (তাহার আয়্ কত?), যায়্, পায়্।

মূলস্বর 'অ' দিয়ে—

১২. অও্ (ao)—যেমন, হও্, নও্, রও, কও্।
১৩. অয়্ (ay)—যেমন, নয়, হয়, বয়, সয়।

মূলস্বর 'ও' দিয়ে—

১৪. ওও্ (oo)--যেমন, শোও্, বোও্।
১৫. ওউ্ (অউ্), ঔ (ou)—যেমন, বৌ (বউ্), নৌ, মউ্।
১৬. ওই্, ঐ (oi)—যেমন, বই, খই, দৈ (দই্)।
১৭. ওয়্ (oy)—যেমন, ধোয়্, শোয়্।

মূলস্বর 'উ' দিয়ে—

১৮. উই্ (ui)—যেমন, রুই, পুঁই্, থুই্, উই্।
১৯. উউ্ (uu)—যেমন, কুউ্ কুউ্।

এবারে শেষ ১২ টি অনিয়মিত সন্ধ্যক্ষর আলোচনা করবো। নিয়মিত সন্ধ্যক্ষরগুলির মতো এগুলো তত স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়ে না। খুব সতর্ক এবং স্বাভাবিক উচচারণে সন্ধ্যক্ষরের সমস্ত গুণ প্রায় বিলুপ্ত হয়, তবে দ্রুত এবং অসতর্কভাবে উচচারণ করলে এরা সন্ধ্যক্ষর রূপে উচচারিত হতেও পারে। উচচারণের উপরই এদের গুণাগুণ রক্ষিত হয়।

মূলস্বর 'ই' দিয়ে—

১. ইয়া (ia)—যেমন, মিয়া, নিয়া, প্রিয়া, ইয়ার।
২. ইয়ে (ie)—যেমন, নিয়ে, গিয়ে, প্রিয়ে, পিয়ে।
৩. ইও (io)—যেমন, নিও, প্রিয়, দিও, ইয়োরোপ।

মূলস্বর 'এ' দিয়ে—

৪. এয়া (ea)—যেমন, খেয়া, নেয়া, দেয়া, কেয়া।
৫. এয়ো (eo)—যেমন, এয়ো, যেয়ো, চেয়ো, (চেও)
৬. এ্যায়া (æa)—যেমন, দ্যায়া (দেওয়া), ন্যায়া (নেওয়া)।

মূলস্বর 'অ' দিয়ে—

৭. অয়া (ɔa)—যেমন, নয়া, দয়া, জয়া।

মূলস্বর 'ও' দিয়ে—

৮. ওয়া (oa)-যেমন, মোয়া, নোয়া, রোয়া, ওয়ার, পোয়া, খোয়া।
৯. ওয়ে (oe)-যেমন, কয়ে, সয়ে, রয়ে।

মূলস্বর 'উ' দিয়ে—

১০. উয়ে (ue)-যেমন, উয়ে, থুয়ে, রুয়ে, শুয়ে।
১১. উয়া (ua)-যেমন, নুয়া, পুয়া, কুয়া, জুয়া।
১২. উয়ো (uo)-যেমন, রুয়ো, থুয়ো।

নিম্নে এক থেকে নয় সংখ্যক পর্যন্ত বাংলা নিয়মিত সন্ধ্যক্ষরগুলি উচচারণে জিহ্বার গতি (movement)-চিত্র দেখানো হলো :

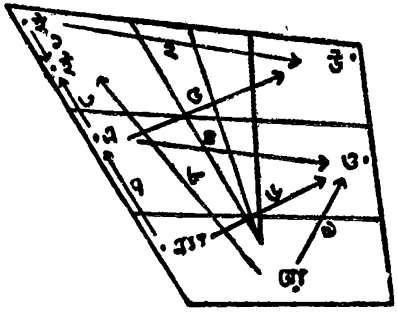

এবং দশ থেকে উনিশ সংখ্যক পর্যন্ত নিয়মিত সন্ধ্যক্ষরগুলির উচচারণে জিহ্বার গতি (movement)-চিত্র নিম্নরূপ :

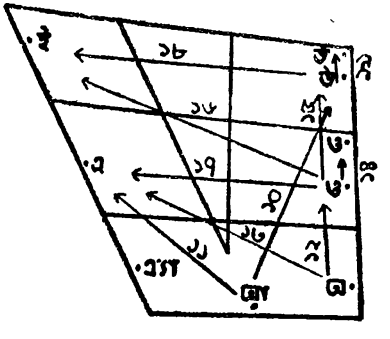

ত্রিস্বরধ্বনি (Triphthong)

দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে পাশাপাশি তিনটি স্বরধ্বনি মিলে যৌগিক স্বরধ্বনি সৃষ্টি হলে তাকে ত্রিস্বরধ্বনি বা tripthong বলে। যথা,—'ইয়েই্' (iei)- যেমন, ক্লাসে গিয়েই শুনলাম; 'ইয়ায়্' (iae)- যেমন, বাংলাদেশ এশিয়ায় অবস্থিত; 'এইয়ো' (eio)- যেমন, টানো জোরে হেইয়ো; 'আওয়া' (aoa)- যেমন, তোমার যাওয়া হলনা; 'ওয়েও' (oeo)- যেমন, কাজটি হোয়েও যেতে পারে; 'ওইয়ে্' (oie)- যেমন, তথ্যটি বইয়ে পাবে; 'উইয়ে্' (uie)- যেমন, ছেলেটিকে শুইয়ে দাও; 'উইও্' (uio)- যেমন, তুইও একথা বিশ্বাস করিস্; 'উয়ায়্' (uae)- যেমন, ঘরটি ধুঁয়ায় ভরে গেল।

চতুস্বরধ্বনি (Tetraphthong)

দ্রুত ও অসতর্ক উচ্চারণে পাশাপাশি চারটি স্বরধ্বনি মিলেও যৌগিক স্বরধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে, তাকে চতুস্বরধ্বনি বা tetrapthong বলে। যথা,- 'এওয়াই্' (eoai)-যেমন, তোমাকে বইটা দেওয়াই্ ভুল হয়েছে; আওয়ায়্' (aoae)- যেমন, তোমার যাওয়ায় অনেকটা ক্ষতি হল।

ব্যঞ্জনধ্বনি—(Consonant Sound)

ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা—Defination of Consonant

ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা মোটামুটি ভাবে স্বরধ্বনির বিপরীত। স্বাভাবিক কথাবার্তার সময় ফুস্‌ফুস্ তাড়িত বাতাস গলনালী, মুখবিবর কিংবা মুখের বাইরে (ঠোঁটে) বাধা পাওয়ার ফলে কিংবা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খেয়ে যে সব ধ্বনি উদ্‌গত হয় সেগুলিকে ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। স্বরধ্বনির সবগুলোই ঘোষধ্বনি কিন্তু ব্যঞ্জনধ্বনিতে ঘোষ ও অঘোষ দুরকম ধ্বনিই আছে।

এ থেকে আমরা যে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর সন্ধান পাই তা হলো—(১) যাবতীয় অঘোষ-ধ্বনি, যেমন—ক, চ, ত, প; (২) বায়ুপথ রুদ্ধ হওয়ার জন্যে যত ধ্বনি উত্থিত হয়, যেমন—গ, ট, ব, ল; (৩) যে সব ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবর দিয়ে না বেরিয়ে নাসা পথে বেরোয়, যেমন,—ঙ, ন, ম এবং (৪) শ্রুতিগ্রাহ্য ঘর্ষণ লেগে যে সব ধ্বনি উৎপন্ন হয়, যেমন, শ, স।

চারটি কি পাঁচটি প্রক্রিয়ার সাহায্যে আমরা ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে মোটামুটি একটা শৃঙ্খলা আনতে পারি। এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও একটি থেকে অন্যটি পৃথক করতে সাহায্য করে। সেগুলি হলো—

ক. উচ্চারণের স্থান, খ. উচ্চারণের স্থানে বায়ুপথের রূপ, গ. তালুর নরম অংশ বা কোমল তালুর অবস্থা [ক. ও খ. এর মধ্যে যদি উল্লেখ না থাকে], ঘ. স্বরযন্ত্রের অবস্থা [ক. ও খ. এর মধ্যে যদি তার উল্লেখ না থাকে], ঙ. স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতার বিচার করে।

(ক) উচ্চারণের স্থান

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী বাঙলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে এভাবে সাজানো যেতে পারে—

১. কণ্ঠ্য বা গলনালীয়—Glottal বা Laryngal.

স্বরতন্ত্রী (vocal cord) সঙ্কোচনের সাহায্যে বায়ুপথ সঙ্কীর্ণ করে, কিন্তু একেবারে বন্ধ করে নয়, এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন, 'হ'।

২. জিহ্বামূলীয়, পশ্চাৎ তালুজাত বা কোমল তালুজাত—Velar

জিহ্বামূল উঁচু করে কোমল তালুর সামনের কি মাঝের সংগে লাগিয়ে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন,—ক, খ, গ, ঘ।

৩. প্রশস্ত দন্তমূলীয়—Dorso Alveolar

জিভের পাতা (blade) দুপাশ চ্যাপ্টা ও চওড়া করে ওপর পাটি দাঁতের মাড়ি (teeth ridge) এবং শক্ত তালুর অগ্রভাগ ও দুপাশকে স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়। যেমন,—চ, ছ, জ, ঝ।

৪. পশ্চাৎ দন্তমূলীয়—Post Alveolar

দাঁতের গোড়ার শেষাংশ ও শক্ততালুর আরম্ভের স্থানে জিভের পাতা উঁচু করে যে ধ্বনি পাওয়া যায়। যেমন,—'শ'।

৫. দন্তমূলীয় মূর্ধন্য বা দন্তমূলীয় প্রতিবেষ্টিত—Alveolar Retroflex

ওপর পাটি দাঁতের গোড়ার সংগে জিভের ডগা উল্টো করে লাগিয়ে (curling up of the tip of the tongue) এ ধ্বনি পাওয়া যায়। এসব ধ্বনির ব্যঞ্জনা দন্তমূলোত্থিত ধ্বনির মতো সুস্পষ্ট রেখায় আমাদের কাছে ধরা পড়ে না - বরং কিছুটা আড়ষ্ট ও প্রতিবেষ্টিত রূপ নেয়। যেমন,—ট, ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়।

৬. দন্তমূলীয়—Alveolar

দন্তমূলের সংগে জিভের ডগা লাগিয়ে যে ধ্বনি করা হয়। যেমন,—র, ল, য (Z), ন, হ্ন, (নহ্), হল (লহ্), হ্ন (রহ্)।

৭. দন্ত্য—Dental

জিভের ডগা উপর পাটি দাঁতের সংগে লাগিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। যেমন—ত, থ, দ, ধ।

৮. ওষ্ঠ্য—Labial

দুঠোঁটের সংস্পর্শে যে ধ্বনি করা হয়। যেমন,— প, ফ, ব, ভ, ম, ক্ষ(ম্হ), অন্তঃস্থ ব=ওয়=w=(oy)।

৯. দন্তৌষ্ঠ্য—Labio Dental

নীচের ঠোঁট ওপরের পাটি দাঁতের দিকে উঁচু করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন,— ফ (f, ϕ), ভ (v, β)।

নীচে বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনি সমূহের উচচারণে জিহ্বা ও ঠোঁটের অবস্থান দেখানো হলো :

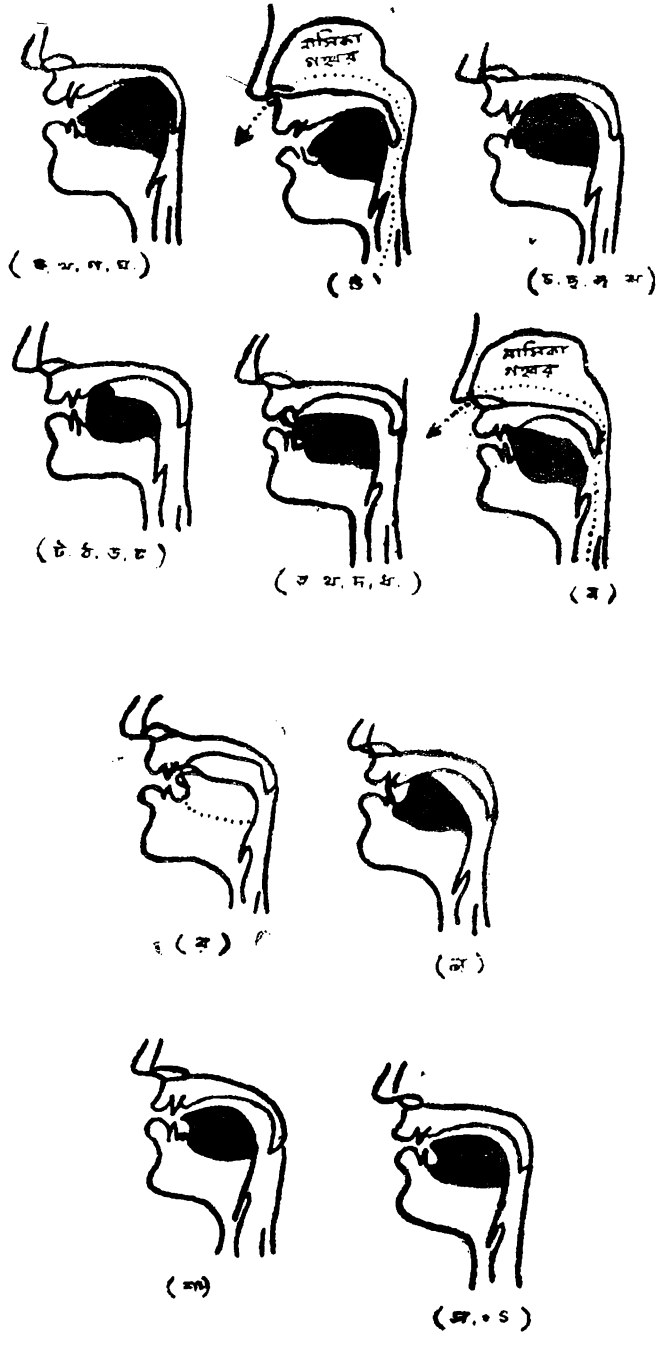

(খ) উচ্চারণের স্থানে বায়ু পথের রূপ

১. স্পৃষ্ট বা স্পর্শধ্বনি—Plosive

ফুসফুস তাড়িত বাতাস বের হয়ে যাবার সময় মুখবিবর কিংবা ঠোঁটের কোন না কোন স্থানে উচ্চারকদের (articulator) পেছনে আটকে গিয়ে সেই স্থানে সামান্যতম সময় অবস্থান করে ঐ স্থানকে আঘাত দিয়ে ফটকার মতো শব্দ করে যে ধ্বনি নির্গত হয় তাকে স্পৃষ্ট বা স্পর্শধ্বনি (plosive) বলে। এ ধ্বনির প্রকৃতি বিশ্লেষণে আমরা তিনটি পর্যায় খাড়া করতে পারি। যথা,—

(অ) ধ্বনি সংগঠনের জন্যে উচ্চারণের স্থান দুটোর সংস্পর্শ ;

(আ) সংস্পৃষ্ট অবস্থায় তাদের কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান (এক সেকেণ্ডের শতাংশের দু চার অংশ কিংবা সামান্য সময় উচ্চারক ও শ্রোতার মনে এ অবস্থার বোধ জন্মে) ;

(ই) উচ্চারণের স্থান দুটো পৃথক হয়ে ফটকার মতো আওয়াজ করে বাতাস বেরিয়ে যাওয়া।

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে স্পর্শ ধ্বনির সংখ্যা সবচাইতে বেশী। কেউ কেউ বিশটি আবার কেউ কেউ ষোলটি স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির উল্লেখ করেছেন। এ মতান্তর চ-বর্গীয় ধ্বনি-গুলো নিয়ে। তবে নিম্নলিখিত স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয়েছে।

ক　খ　গ　ঘ

চ　ছ　জ　ঝ

ট　ঠ　ড　ঢ

ত　থ　দ　ধ

প　ফ　ব　ভ।

২. ঘর্ষণজাত বা ঘৃষ্টধ্বনি—Affricate

এগুলোও এক প্রকার স্পর্শধ্বনি। তবে উচ্চারক অংশ দুটো (জিভ এবং দন্তমূলের যে অংশে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়) স্পর্শ ধ্বনির তুলনায় অপেক্ষাকৃত ধীরে পৃথক হয় এবং ফুস্‌ফুস তাড়িত বাতাস উচ্চারকদের ধাক্কা দিয়ে বেরুতে গিয়ে ফটকার মতো আওয়াজ না করে উক্ত অংশ দুটোকে আলগা করেই তাদের কাছে চাপা খেয়ে যায় (plosive followed by corresponding frication)। উদাহরণ— ঢাকার কুট্টিদের চ-বর্গীয় ধ্বনি উচ্চারণ—চ, ছ, জ, ঝ (ts, tsh, dz, dzh)।

৩. নাসিক্য ধ্বনি—Nasal

স্পর্শধ্বনির মতো মুখবিবর কিংবা ঠোঁট বন্ধ হয়ে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে থাকে। উচ্চারকেরা (articulators) একে অন্যের সাথে সংস্পর্শ লাভ করে কিন্তু পর মুহূর্তেই পশ্চাৎ তালুর মাংসল অংশ নীচের দিকে নেমে আসায় নাসাপথ মুক্ত হয় (opens naso pharynx) এবং ফুসফুস তাড়িত বাতাস মুখের বদলে নাসাপথ দিয়ে নির্গত হয়। কোমল তালু ঝুলে পড়ে নাসাপথ উন্মুক্ত করে দেয় বলে মুখবিবর কিংবা ঠোঁট বন্ধ থাকা অবস্থায় এ ধ্বনিকে ইচ্ছা মতো প্রলম্বিত করা যায়। তাই একে প্রলম্বিত ধ্বনিও (Continent) বলা হয়। স্পর্শ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য—উচ্চারকদের সংস্পর্শ, কিছুক্ষণ তদাবস্থায় অবস্থান—এতে পাওয়া গেলেও এ ধ্বনি উচ্চারকদের পশ্চাদস্থিত বায়ু উচ্চারকদের ফটকার মতো শব্দ করে নির্গত হয়ে উচ্চারিত হয়না বরঞ্চ উল্লিখিতভাবে নিঃশ্বাস বায়ু নাসাপথ দিয়ে নির্গত হয় এবং এ ধ্বনিতে প্রলম্বন গুণ থাকে। সুতরাং এ ধ্বনিতে স্পর্শতা গুণ যা আছে—স্বাতন্ত্র্য আছে তার চেয়ে বেশী এবং সে-জন্যেই প্রাচীন বৈয়াকরণদের মতে এ ধ্বনিকে স্পর্শ শ্রেণীভুক্ত না করে একে নাসিক্য (Nasal) ধ্বনি বলাই বিধেয়। নাসিক্যব্যঞ্জনের সঙ্গে অনুনাসিক বা সানুনাসিক স্বরধ্বনির প্রভেদ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সানুনাসিক স্বরধ্বনি উচ্চারণে নাসিক্য ব্যঞ্জনের মতো ফুসফুস তাড়িত বাতাস শুধুমাত্র নাসাপথ দিয়ে নির্গত হয় না। কোমলতালু এ ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে নাসাপথ আবৃত না করায় এ ধ্বনিতে নাক ও মুখের মিলিত দ্যোতনা পাওয়া যায়। স্বরসহ উচ্চারণ কালে নাসিক্যব্যঞ্জনের (ম+অ, ন+অ) ক্ষেত্রে মুখ দিয়েও বাতাস নির্গত হয় বটে কিন্তু তা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের জন্যেই তা বলা বাহুল্য। এ ছাড়া সানুনাসিক স্বরধ্বনি লেখা হয় স্বরধ্বনির ওপর 'ঁ' (চন্দ্রবিন্দু) দিয়ে। চন্দ্রবিন্দু স্বতন্ত্র ধ্বনি পরিজ্ঞাপক হরফ নয়, তা অতিরিক্ত চিহ্ন বা diacritic mark কিংবা সামগ্রিক ধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্ন বা prosodic mark মাত্র।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির জন্য বাংলায় এ ছ'টি হরফ ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ং থাকলেও বাংলার মূল নাসিক্যধ্বনি কেবলমাত্র তিনটি— ঙ, ন, ম (phoneme)। এ ছাড়া বর্ণমালায় আর যে বর্ণ বা উচ্চারণে আর যে ধ্বনি পাওয়া যায় তা এরই অন্তর্ধ্বনি (allophone)।

।। 'ঙ' ।।

'ঙ' পশ্চাৎতালুজাত ঘোষধ্বনি। এ ধ্বনি শব্দের কেবল মধ্যে ও শেষে ব্যবহৃত হয়। যেমন, বাঙলা রঙ, ইত্যাদি। ঙ ছাড়া আমাদের বর্ণমালাতে ং (অনুস্বর) বলে একটা স্বতন্ত্র ধ্বনি পাওয়া যায় কিন্তু উচ্চারণের দিক থেকে তা 'ঙ'-র সঙ্গে অভিন্ন। ক-বর্গের ধ্বনির প্রথমে সাধারণতঃ অনুস্বর বেশী ব্যবহৃত হয়। যেমন, সংকল্প, সংগীত। অবশ্যি 'ঙ'ও ব্যবহার করা যায়। 'ঙ'-তে স্বরধ্বনি যোগ করা যায়। যেমন, বাঙালী, রাঙা ইত্যাদি। ক-বর্গীয় ধ্বনির আগে এবং বাঙলার বাইরে সকল নাসিক্যধ্বনির প্রতীক হিসেবেই 'ং' ব্যবহৃত হয় কিন্তু এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ নেই, যখন যে ব্যঞ্জনের আগে আসে তারই প্রভাবিত নাসিক্য ধ্বনিরূপে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, তা সর্বদা পরবর্তী বর্গীয় ধ্বনির নাসিক্যধ্বনিজ্ঞাপক চিহ্ন (prosodic mark)। যেমন, সংপাত (সম্পাত), সংবাদ (সম্বাদ), কংটক (কণ্টক)।

।। 'ঞ, ণ, ন' ।।

এই তিনটি প্রতীকের ধ্বনি একই সঙ্গে আলোচিত হবে। প্রথমে 'ন' পরে 'ঞ' ও 'ণ' সম্বন্ধে আলোচনা করব। আলোচনার সময়ে এর কারণ স্পষ্ট হবে।

॥ 'ন' ॥

দন্তমূলীয় স্বল্পপ্রাণ ঘোষ—ন (n)
দন্তমূলীয় মহাপ্রাণ ঘোষ—ন্হ (nh)

ন—এর তিনটি (allopone) বা সহধ্বনি আছে—

(ক) দন্ত্য ন (n)-'ত'-বর্গের আগে উচ্চারিত হয়। যেমন, —দন্ত, পন্থা, সন্ধ্যা। বাঙলায় এর কোন হরফ নেই।

(খ) প্রশস্ত দন্তমূলীয় বা দন্তমূলীয় তালব্য—বর্ণমালার ঞ (ṇ) রূপে প্রতিবিম্বিত চ-বর্গীয় ধ্বনির আগে উচ্চারিত হয়। যেমন,— বাঞ্ছা, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি।

(গ) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ণ (n)—'ট'-বর্গীয় ধ্বনির আগে প্রতিবেষ্টিত হয়ে এ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন, কণ্টক, উৎকণ্ঠা, ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

ন-এর মহাপ্রাণ রূপ 'ন্হ' (nh)—যেমন, চিহ্ন, অপরাহ্ন, পূর্বাহ্ন ইত্যাদি। কিন্তু অঞ্চল বিশেষের উচ্চারণে এটি বিকৃত বা দ্বিস্বরূপে উচ্চারিত হয়।

॥ 'ম' ॥

ওষ্ঠ্য স্বল্পপ্রাণ ঘোষ—ম (m),
ওষ্ঠ্য মহাপ্রাণ ঘোষ—ম্হ, (mh)।

ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদিতে ম্হ উচ্চারণ ধ্বনির প্রথমাংশ প্রলম্বিত হয়ে শ্রোতার কানে দ্বিত্ববোধক আভাস এনে দেয় আর শেষাংশ নিঃশ্বাসের একই প্রয়াসে (one effort of articulation) সজোরে নির্গত মহাপ্রাণ ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়।

(8) পার্শ্বিক ধ্বনি— (Lateral sound)

মুখবিবরকে দুপাশ থেকে ভাগ করে তার ঠিক মাঝখানে বাতাসের গতিপথ ব্যাহত করে এই ধ্বনি উচ্চারিত হয়। ফুসফুস তাড়িত বাতাস সম্পূর্ণ মুখবিবর ধরে বেরুতে গিয়ে সামনের বড়ো দাঁত দুটোর মাঝখানে সোজাসুজি ওপর পাটির দাঁতের মাড়ির সংগে জিহ্বার পাতার সংস্পর্শের জন্য সেখানে ব্যাহত হয় এবং জিহ্বা ও চোয়ালের মধ্যে ফাঁক থাকার জন্যে বাতাস কমবেশী দু'পাশ কিংবা একপাশ দিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবে ধ্বনিটি পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত হয় বলে একে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে।

বাঙলায় পার্শ্বজাত মূলধ্বনি মাত্র একটি। সে হলো দন্তমূলীয় ঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'ল' (L)। উচ্চারকদের স্বল্পতম প্রয়াসে এর ধ্বনিগতরূপ ফুটে ওঠে। এ জন্য একে তরল ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে।

ল-এর মহাপ্রাণ রূপটি হলো ল্হ বা হ্ল। যেমন,—হ্লাদিনী, আহ্লাদ ইত্যাদি।

ল—এর allophone বা সহধ্বনি দুটো নিম্নরূপ—

(ক) দন্ত্য ল—ত-বর্গের আগে এলে, যেমন,—আলতা, গলদা।
(খ) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ল— ট-বর্গের আগে এলে, যেমন,—উল্টা, পাল্টা।

(৫) কম্পনজাত ধ্বনি—trilled sound

ফুসফুস নির্গত বাতাস মুখ বিবর দিয়ে বেরুবার সময় নড়নক্ষম (নমনশীল) কোন প্রত্যঙ্গের (জিভের কোন অংশের কিংবা আল জিহ্বার) দ্রুত ও ঘনঘন কাঁপন লেগে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয় তাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। যেমন,—বাংলা 'র', উচ্চারণ র্ কিংবা র্‌র্; জার্মান ও ফরাসী আলজিভের কাঁপুনিজাত 'র', 'র্‌র্‌র্'।

জিহ্বার ডগাকে ওপর পাটি দাঁতের গোড়ায় স্পর্শ করিয়ে 'র' উচ্চারণ করা হয়। উচ্চারকদের একবার স্পর্শেই এ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে পারে। সে ক্ষেত্রে একে স্পর্শজাত ধ্বনি বলা যেতে পারে। কিন্তু বাঙলায় 'র' জিহ্বা ও স্বরতন্ত্রী উভয়ের কাঁপুনিতেই উত্থিত হয়। এ জন্যেই একে trilled orrolled ধ্বনি বলে।

'র্'—এর একটা allophone আছে। ত-বর্গের আগে তা দন্ত্যরূপে উচ্চারিত হয়। যেমন,—ভর্তা(ভরতা), স্বার্থ (স্বারথ), মর্দা (মরদা), গর্দভ (গরদভ)।

এ ছাড়া র-এর মহাপ্রাণ রূপ র্‌হ্ (rh)। এতে এ-কার যোগ করলে হয় হ্রে, (হ্রেষা--rhesha), আ-কার যোগ করলে হয় হ্রা (হ্রাস—rhas), ই-কার দিলে হয় হ্রি (হৃদয়—rhiday)। অন্য কোন স্বরধ্বনি যুক্ত না করলে অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনির মতো সহজাত অ-স্বরধ্বনিটি নিয়ে এটি লিখিত ও উচ্চারিত হয় হ্র (হ্রদ—rhad) ও র্হ (বর্হ—barho) রূপে। তবে এর মহাপ্রাণতা বর্তমানকালে উভয় বাংলাতেই লোপ পেতে বসেছে (হৃদয়=রিদয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর: বুড়ো আঙলা।)

'র' কে আমরা তরলধ্বনি রূপেও চিহ্নিত করতে পারি।

৬. তাড়নজাত ধ্বনি—(flapped sound)

মুখ বিবরের মধ্যে বায়ুপথ রোধ করবার জন্যে নড়নক্ষম (নমনীয়) কোন প্রত্যঙ্গের (অর্থাৎ জিহ্বাগ্রের) সামান্যতম স্পর্শে যে ধ্বনি উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ ওপর পাটি দাঁতের গোড়ার জিহ্বাগ্রের উল্টো পিঠের স্বল্প স্থায়ী সংস্পর্শজাত ধ্বনি। যেমন,—

দন্তমূলীয় ঘোষ অল্পপ্রাণ—-ড়
প্রতিবেষ্টিত ঘোষ মহাপ্রাণ—ঢ়

এ স্বল্প পার্থক্যের জন্যে এদেরকে অর্ধবর্গীয় বা দন্তমূলীয় তাড়নজাত বর্গীয় ধ্বনি বলে অভিহিত করা হয়। এ ধ্বনি দুটো উচ্চারণ কালে জিহ্বার ডগার উল্টো পিঠ উপর পাটি দাঁতের গোড়াকে স্পর্শ করতে না করতেই দ্রুত নেমে এসে নীচের পাটি দাঁতের ওপর উছলে পড়ে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় বলে একে তাড়নজাত ধ্বনি বলা হয়।

৭. উষ্ম তথা শিস্‌ধ্বনি বা শ্বাসজাত ধ্বনি—(fricative sound)

'উষ্ম' শব্দের অর্থ নিঃশ্বাস। ফুসফুস তাড়িত বাতাস বাইরে যাবার কালে গলনালী থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখ বিবরের বিভিন্ন জায়গায় বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে চাপা খেতে পারে কিংবা লাগতে পারে। এর ফলে এক ধরনের ঘর্ষণজাত শিস্‌ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এ কতকটা সাপের শ্বাস ছাড়ার শব্দের মতো শোনায়। ইংরেজী 'hissing sound'-এর সাথে এর স্বগোত্রতা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মতে এ ধ্বনিকে নিঃশ্বাস আশ্রয়ী (spirant) বা শিস্‌ধ্বনি—'sibilant' বলা হতো। ঘর্ষণজাত হয় বলে তাঁরা এর নামকরণ করেছেন 'fricative sound'। ঘর্ষণজাত শ্বাস থেকে শিস্‌ধ্বনির উৎপত্তি হয় বলে মুখের মধ্যে এ ধ্বনিকে ধরে রাখা কিংবা প্রলম্বিত করা খুব সহজ।

বাংলা শিস্‌ধ্বনি হলো পশ্চাৎ দন্তমূলীয় অঘোষ স্বল্পপ্রাণ 'শ',—এটি মূল ধ্বনি। নাসিক্য, পার্শ্বিক ও কম্পনজাত ধ্বনির মতো এটিও প্রলম্বিত ধ্বনি। এর কয়েকটি অন্তর্ধনি (allophone) আছে।—

(ক) দন্ত্য স—কেবলমাত্র ত-বর্গীয় ত, থ ধ্বনির আগে। যেমন, সন্তা, অবস্থা।
(খ) দন্তমূলীয় মূর্ধন্য ষ—বর্গীয় ট, ঠ, এর আগে। যেমন, কষ্ট, কাষ্ঠ।

(গ) অগ্রদন্তমূলীয় শ—শ্রাবণ, শ্রী, শ্রীল, স্নান, স্নেহ।

শ-এর কোন মহাপ্রাণ প্রতিরূপ নেই। আরবী থেকে গৃহীত য (zh) ধ্বনি শ-এর মহাপ্রাণ রূপ নয়। নামায, রোযা প্রভৃতি শব্দের য-কে দন্তমূলীয় ঘোষ উষ্মধ্বনি বলা হয়।

এ ছাড়া আর একটি উষ্মধ্বনি আছে। তা হলো—হ। এ ধ্বনির নামকরণ নিয়ে ধ্বনিতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। তবে তাকে গলনালীয় বা স্বরতন্ত্রীজাত স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি বলা যায়।

চলতি বাঙলায় ফ (ph), ভ (bh) ধ্বনি দুটো ওষ্ঠ্য স্পৃষ্ঠ ধ্বনি কিন্তু আঞ্চলিক উচ্চারণে তা যথাক্রমে দন্তৌষ্ঠ্য অল্পপ্রাণ (f) ও দন্তৌষ্ঠ্য মহাপ্রাণ (v) উষ্মধ্বনি নোয়াখালীতে প উচ্চারণই হয় না।

অন্তঃস্থ ব উচ্চারণের তারতম্যে কখনো অর্ধস্বর, কখনো স্বল্পপ্রাণ ঘোষ ওষ্ঠ্য উষ্মধ্বনি হয়।

(গ) কোমলতালুর অবস্থা

কোমল তালুর অবস্থার দিক থেকে বিচার করে সমগ্র ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কোমল তালু ঝুলে পড়ে নাসাপথ উন্মুক্ত করে দিলে নাসিকাজাত ধ্বনি উদ্গত হয়। এ ধ্বনি দু'রকম—নাসিক্য ব্যঞ্জন ও অনুনাসিক স্বরধ্বনি। অনুনাসিক স্বরধ্বনিতে মুখ ও নাকের মিলিত দ্যোতনা থাকে।

২. কোমল তালু উঁচু হয়ে নাসাপথ বন্ধ করে দিলে সে অবস্থায় উত্থিত মৌখিক (oral) ধ্বনি। এটির অন্তর্গত হলো—অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি ও সকল স্বরধ্বনি।

ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণের স্থান

উচ্চারণের রীতি		জিহ্বামূলীয়		প্রশস্ত দন্তমূলীয়		পশ্চাৎ দন্তমূলীয়	দন্তমূলীয়		দন্তমূলীয় মূর্ধন্য		দন্ত্য		ওষ্ঠ্য		দন্তৌষ্ঠ্য		আ' স্বর-যন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয়
		অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্পপ্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	অল্প-প্রাণ	মহা-প্রাণ	মহাপ্রাণ
স্পৃষ্টধ্বনি	অঘোষ	ক	খ	চ	ছ				ট	ঠ	ত	থ	প	ফ			
	ঘোষ	গ	ঘ	জ	ঝ				ড	ঢ	দ	ধ	ব	ভ			
ঘৃষ্টধ্বনি	অঘোষ			চ★	ছ★												
	ঘোষ			জ★	ঝ★												
উষ্ম বা শিসধ্বনি	অঘোষ			চ★	ছ★	শ	স		(য)					(ফ)		(ফ)	ঃ
	ঘোষ				ঝ★		য						(ব)	(ভ)		(ভ)	হ
নাসিক্যধ্বনি	ঘোষ	ঙ(ং)		(ঞ)			ন	হ্ন	(ণ)				ম	হ্ম			
পার্শ্বিকধ্বনি	ঘোষ						ল	হ্ল									
কম্পনজাতধ্বনি	ঘোষ						র	হ্র									
তাড়নজাতধ্বনি	ঘোষ								ড়	ঢ়							
6	6	6		9		6	9		9		6		9		9		9

★আঞ্চলিক।

বন্ধনীযুক্ত ধ্বনিগুলো দ্রুত উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট স্পর্শধ্বনির বিকল্পধ্বনি কিংবা কোন মূলধ্বনির সহধ্বনি।

(ঘ) স্বরযন্ত্রের অবস্থা

স্বরযন্ত্রের অবস্থা বিচার করে বাংলা ধ্বনিগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।—

১. অঘোষ ধ্বনি—সামনে থেকে পুরুষের গলায় যে উঁচু অংশটি দেখা যায় তাকে larynx বলে। গলনালীর ভিতরের এই larynx-এর মধ্যে দুটো শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আছে। সেগুলোকে স্বরতন্ত্রী বা vocal cords বলে। যে সব ধ্বনি উচ্চারণে এই স্বরতন্ত্রীতে কাঁপন লাগেনা তাকে বলে অঘোষধ্বনি। যেমন,-বর্গীয় প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি অঘোষ, যথা—ক, চ, ট, ত, প, খ, ছ, ঠ, থ, ফ, শ, স।

২. ঘোষধ্বনি—যে সব ধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী কাঁপে সেগুলো ঘোষধ্বনি। যেমন, সকল স্বরধ্বনি এবং বর্গীয় তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি ঘোষ। ব্যঞ্জনধ্বনি গুলো, যথা গ, জ, ড, দ, ব, ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ, ঙ, ন, ম, র, ল, ড়, ঢ়, হ, র্হ, ম্হ, ল্হ, ন্হ।

(ঙ) স্বল্পপ্রাণতা ও মহাপ্রাণতা—

ফুসফুস চালিত বাতাসের চাপের স্বল্পতা এবং আধিক্যের দিক থেকেও ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু'ভাগে করা যায়।

১. স্বল্পপ্রাণ—যে সব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস চালিত বাতাসের চাপ অল্প। যেমন, বর্গীয় প্রথম ও তৃতীয় ধ্বনি—ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব এবং র, ল ড়, ন, ঙ, ম, শ, স।

২. মহাপ্রাণ—যে সব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস চালিত বাতাসের বেগ বেশী। যেমন, বর্গীয় দ্বিতীয় ও চতুর্থধ্বনি—খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ, এবং ঢ়, হ, ন্হ, র্হ, ম্হ, ল্হ।

পাদটীকা

১ কাজী দীন মুহম্মদ, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য পত্রিকা, ১৩৮৬ শীত সংখ্যা, পৃ. ১—২৫।

২ এ প্রবন্ধে ধ্বনি বিজ্ঞান (Phonetics) সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology) সম্বন্ধে বিশদ ভাবে আলোচনা করা হবে।

৩ মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বাংলা একাডেমী, ১৩৭২ পৃ. ১১।

৪ মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ১৩৭১, পৃ. ১৮।

৫ মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ১৩৭১, পৃ. ১৮।

৬ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, A brief sketch of Bengali phonetics.

৭ ডক্টর সুকুমার সেন, ভাষাতত্ত্ব, ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা—৯, একাদশ সংস্করণ, পৃ. ১৯১।

৮ ৫ নং স্বরধ্বনি ও [o]-এর বিকল্প ও' [o'] উচ্চারণের সম্বন্ধে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

৯ মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী ১৩৭২, পৃ. ২৩

১০ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, Nasals and nasalization in Bengali, Dacca.

১১ মুহম্মদ আবদুল হাই, ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, ১৩৭২, বাংলা একাডেমী, পৃ. ১৫০ ও পরবর্তী।